আমার-পূর্ব্বপুরুষ।

(চন্দ্রদ্বীপ এবং সেলিমাবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সহিত)।

কনকলতা, চিতোর-উদ্ধার, চণ্ডবিক্রম, প্রমোদবালা,
মায়াবিনী, কিরণসিংহ ও সুধামুখী
প্রভৃতি প্রণেতা
শ্রীরোহিণীকুমার সেনগুপ্ত-প্রণীত

কীর্ত্তিপাশা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।"

কলিকাতা,
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীললিতমোহন দাস
দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০২ সাল।

বিনামূল্যে বিতরিত।

শ্রীশ্রীপিতৃচরণেভ্যোনমঃ ।

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ

মাধ্বীর্ণ সন্তোষধীঃ মধুনক্ত মুতোষসো

মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধুদ্যোরস্তনঃ পিতা

মধুমান্নো বনস্পতির্ম্মধু মাঅস্তু সূর্য্যঃ

মাধ্বীর্গা বো ভবন্তু নঃ ।

ওঁ মধু মধু মধু

ঋগ্বেদ ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

পরমার্চ্চনীয়া।

প্রত্যক্ষদেবীস্বরূপিনী সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী

মদীশ্বরী স্বর্গীয়া মাতৃ দেবীর

শ্রীশ্রীচরণোদ্দেশে।

মা!

অভাগার সাধপূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মধুর 'মা' ডাক ফুরাইয়াছে; শত সহস্র আত্মীয় স্বজন পরিবৃত থাকিয়াও আমি মাতৃহীন; জানি না কোন্ পাপে বিধাতা আমার প্রতি এরূপ কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। (যে দিন প্রথমে আপনার পূত শ্রীচরণ সমীপে, মদ্ রচিত প্রথম পুস্তক দুইখানি উৎসর্গ করিয়াছিলাম—মৎকর্ত্তৃক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করতঃ আমাকে পঞ্চম-বর্ষীয় শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করিয়া শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—তারপর আমার দেবতুল্য পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মাগণের মহীয়সী কীর্ত্তিগাঁথা সঙ্কলন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন—আমার জীবনের সেই স্মরণীয় দিন এ জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব না।) অনেক দিন পরে, আপনার সেই অনুজ্ঞা প্রতিপালিত হইতে চলিল। কিন্তু আজীবন আমার মনে এই ক্ষোভ থাকিল যে, যাঁহার আদেশে এই গ্রন্থ প্রচারিত হইল, তিনি একবার দেখিলেন না; এই দুঃখ আজীবন হৃদয় মধ্যে নিহিত থাকিবে। আপনি দেবী, স্বর্গে বসিয়া অবশ্যই সমস্ত দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু এই হতভাগ্যের অদৃষ্টে বিধাতা সেই সুখটুকু লিপিবদ্ধ করেন নাই।

কীর্ত্তিপাশা	}	আপনার চির সেবক
তারিখ ১লা বৈশাখ		হতভাগা মাতৃহীন
১৩০২ সাল		সন্তান।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

আমাদের ষ্টেটের পুরাতন কর্ম্মচারিগণের এবং গ্রামস্থ বৃদ্ধ ভদ্রলোকগণের মুখে শ্রবণ করিয়া "আমার পূর্ব্ব পুরুষ" নামক গ্রন্থখানিতে তারিখ সমূহের এবং ঘটনাবলীর সন্নিবেশ করিয়াছি। সুতরাং এই সমুদায় অবলম্বনে আমাদের ষ্টেটের কোন বৈষয়িক কার্য্যের মীমাংসা হইতে পারিবে না।

কীর্ত্তিপাশা
১৫ই জ্যৈষ্ঠ,
১৩০৩ সাল।



গ্রন্থকার।



ভূমিকা।

বাখরগঞ্জ জেলার প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া দুর্ঘট। বিগত ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে এই জেলার ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এইচ্ বেভারিজ মহোদয় (H. Beveridge) যে ইতিহাস প্রণয়ন করেন, ইহার পূর্ব্বেই কি ইহার পরেও এই জেলার কোনও ইতিহাস প্রণীত হয় নাই। উক্ত সাহেব বাহাদুর, গবর্ণমেণ্ট গেজেট, রিভিউ, প্রোসিডিংস্, মিনিট, এবং ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে স্থানীয় অবস্থা, স্বাস্থ্য ও উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতির বিষয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কতক কতক এই জেলার লোক হইতে অবগত হইয়াছিলেন। স্থূল কথা এই জেলা এবং ইহার অধিবাসী সম্বন্ধে নানা প্রকার গল্প প্রচলিত আছে; সাহেব বাহাদুরও ইহার অনেকগুলি তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই গল্প মধ্যে কতকগুলি, বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তুলনা করিতে গেলে, সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়, আমিও এই পুস্তক রচনা সম্বন্ধে উক্ত সাহেব বাহাদুর প্রণীত গ্রন্থের ঐতিহাসিক ঘটনার সাহায্য লইয়াছি।

আমাদের বংশাবলীর ধারা বাহিক নাম, ও তন্মধ্যে অধিকাংশ মহাত্মাগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব সংগ্রহ করিয়াছিলেন; সুতরাং সেই সম্বন্ধে আমার অন্যস্থানে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হয় নাই। এই জেলায় এবং ভিন্ন ভিন্ন জেলায় আমার পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মাগণ সম্বন্ধে অনেক প্রকার গল্প প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে অনেকাংশই প্রকৃত। আমিও আমাদের আদিপুরু

৺দুর্গাদাস সেন হইতে ৺কৃষ্ণরাম সেন পর্য্যন্ত যে যে বিষয় লিখিয়াছি, তাহার অনেকাংশ দেশ প্রচলিত জনপ্রবাদ। আমাদের ভূসম্পত্তির প্রারম্ভ হইতে, আমার পিতৃদেবের সময় পর্য্যন্ত ইতিহাসের বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা সমস্তই আমাদের ঘরের বিশ্বস্ত পুরাতন দলীলপত্র হইতে সংগৃহীত, তন্মধ্যে অধিকাংশ কাগজ আদালতে দর্শিত; সুতরাং তাহা সমস্তই সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস।

আমার অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ৺রাজারাম সেন মহাশয় হইতে আমার পিতামহ ৺রাজকুমার সেন মহাশয়ের জীবনের অনেক ঘটনা আমি, আমার মাতৃ প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি; তন্মধ্যে অধিকাংশ ঘটনাই প্রকৃত।

আমার পিতামহ ঠাকুরের সমবয়স্ক অনেক লোক এখনও জীবিত আছেন, তন্মধ্যে তাঁহার সাময়িক কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নয়ানচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র ভদ্র মহাশয়গণ প্রমুখাৎ অনেক বিষয় অবগত হইয়াছি।

কীর্ত্তিপাশার সন্নিহিত রণমতি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকুমার গুপ্ত মহাশয়ের বয়স ৮৫ বৎসরের অধিক হইয়াছে; তিনি আমার প্রপিতামহ ৺কালীকুমার বাবুকে দেখিয়াছেন। আমার প্রপিতামহী যখন স্বামীর সহগামিনী হইয়াছিলেন, তখন উক্ত গুপ্ত মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সেই ঘটনা আমি যে প্রকার তাঁহার নিকট জ্ঞাত হইয়াছি, তাহাই অবিকল লিখিলাম।

আমার পিতামহদেবের মৃত্যুর পর, আমার স্বর্গীয় জনক, বরিশালস্থ মাননীয় মৃতমহাত্মা, জে, এইচ রেলী এবং তাঁহার স্বর্গগতা সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যজীবনী সম্বন্ধে উক্ত সাহেব বাহাদুর যাহা বলিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছি।

আমার পিতামহঠাকুরের অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র ভদ্র মহাশয় তৎকালীন আমার পিতৃদেবের সঙ্গে ছিলেন ; তাঁহার নিকটও অনেক বিষয় অবগত হইয়াছি।

রায়েরকাঠি রাজবংশের অন্যতম বংশধর, মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজা অদ্বৈতনারায়ণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার মহামান্য পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মাগণ সম্বন্ধে অনেক অনেক প্রধান ঘটনা জ্ঞাত হইতে পারিয়াছি ; তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট এবং উল্লিখিত মহোদয়গণের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

কীর্ত্তিপাশা
তাং ২রা বৈশাখ
১৩০২ সাল

গ্রন্থকার।

আমাদের ঐকান্তিক হিতাকাঙ্ক্ষী নলছিটি বিভাগের সুযোগ্য স্কুল সব্‌ইনেস্পেক্টর পূজ্যপাদ শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ রহিলাম।

গ্রন্থকার।



আমার পূর্ব্বপুরুষ।

চন্দ্রদ্বীপ

অতি পূর্ব্বকালে এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের অধিকাংশ উত্তাল তরঙ্গময়ী, এক বিশাল নদীগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। এই নদীর নাম সুগন্ধা *; এই দেশে সোন্ধা বলিয়া ঐ নদীর নাম প্রচলিত।

অতি পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপ ব্যতীত এই জেলায় আর কোন প্রসিদ্ধ স্থান ছিল না। ক্রমে ক্রমে, ঐ চন্দ্রদ্বীপ হইতে প্রায় ৫০ পঞ্চাশটীর অধিক পরগণার সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ চন্দ্রদ্বীপ সৃষ্টি সম্বন্ধে দুইটী আশ্চর্য্য কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। মাননীয় বেভারিজ সাহেব মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে ঐ দুইটী গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। আমিও পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবৃত্তি করিবার জন্য ঐ দুইটী গল্প বর্ণন করিব।

---

* মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় প্রণীত অন্নদামঙ্গলের মধ্যে আমরা সুগন্ধার উল্লেখ দেখিতে পাই। জগন্মাতা দক্ষালয়ে প্রাণত্যাগ করিলে, শোকোন্মত্ত মহাদেব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলে, বিষ্ণু চক্র দ্বারা সতীদেহ ৫১ খণ্ডে বিভক্ত করেন, জগদম্বার নাসিকা এই নদী মধ্যে পতিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম সুগন্ধা হইয়াছে।

"যখন এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের প্রায় অধিকাংশ স্থল সুগন্ধা নদীর গর্ব্ভে বিলীন ছিল, তখন বিক্রমপুর পরগণায় চন্দ্রশেখর বলিয়া ধার্ম্মিক, শুদ্ধাচার, তপানুশীল এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বদা পূজা, যোগ, ইষ্টমন্ত্র জপ প্রভৃতি দ্বারা সময়াতিবাহিত করিতেন। তাঁহাকে সুপাত্র দেখিয়া, অন্য এক ব্রাহ্মণ সন্তান তাঁহার সহিত, স্বীয় সর্ব্বগুণ সম্পন্না পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ প্রদান করিলেন। সম্প্রদানের সময়ে চন্দ্রশেখর সভয়ে শুনিলেন, যে তাঁহার নববিবাহিতা পত্নীর নামের সহিত, তাঁহার উপাস্য দেবীর নাম এক। তাঁহার মস্তকে যেন সহস্র বজ্রাঘাত হইল। যে উপাস্য দেবীকে দিবারাত্রি ডাকিয়া থাকেন, আজ তাঁহার সেই উপাস্য দেবীকে নাম ধরিয়া আরাধনা করিলে, স্ত্রীকে মনে পড়িবে; যাহাকে মা বলিয়া ডাকিলে, স্ত্রীর নাম স্মরণ হইবে, এবং সেই স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে তিনি ঘোরতর পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইবেন—অকস্মাৎ ব্রাহ্মণের হৃদয়ে এই সকল চিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, যখন তাঁহারই পাপফলে তিনি এই প্রকার পাপে লিপ্ত হইয়াছেন, তখন জীবন ত্যাগ ব্যতীত কিছুতেই আর এই অতি গর্হিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এই স্ত্রীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবার পূর্ব্বেই তিনি আত্মনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ধীরে ধীরে বিবাহকার্য্য সমাধা হইল। বর কন্যার স্ত্রী আচার পর্য্যন্ত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে বাসর ঘরে যাইবার পূর্ব্বেই পলায়ন করিলেন। সেই বিবাহের বেশে, গভীর নিশীথ সময়, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ একাকী পলায়ন করিয়া স্বীয় গৃহে আসিলেন। ধীরে ধীরে একখানি ক্ষুদ্র তরণী আরোহণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষেপনী সহযোগে ভাসমান হইলেন। তৎকালে বিক্রমপুরের দক্ষিণে অনন্ত

জলরাশি; ব্রাহ্মণ, এই সমুদ্র তুল্য নদীগর্ব্ভে দেহত্যাগ করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষেপনী সহযোগে সেই উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে স্বীয় ক্ষুদ্র জীর্ণ তরণী ভাসাইলেন। রাত্রি প্রভাত হইল; চতুর্দ্দিকে অনন্ত জলরাশি, তরঙ্গাভিঘাতের শ্রবণ ভীতিকর শব্দ; বায়ুর উচ্ছৃঙ্খল গতি। ব্রাহ্মণ, একাকী সেই ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ করিয়া স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। এই প্রকার সেই দিন সেই রাত্রি গত হইল; জনমানব কেন, আকাশে উড্ডীয়মান কোন পক্ষীও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। এই প্রকারে সেই দিনও গত হইল। তার পরদিন সূর্য্যোদয়ের পর ব্রাহ্মণ অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র তরণী আরোহণে অসামান্যা রূপবতী এক কিশোরীকে দেখিতে পাইলেন। এই সমুদ্র তুল্য ভীষণ নদী-গর্ব্ভে, একাকিনী এক বালিকাকে দেখিতে পাইয়া চন্দ্রশেখর অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন এবং কৌতুহলী হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার তরণী, বালিকার তরণীর নিকটবর্ত্তী হইলে, ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন। "তুমি কোন্ সাহসে একাকিনী এই সমুদ্র মধ্যে আসিয়াছ? তোমার কি প্রাণের ভয় নাই?"

ব্রাহ্মণের কথা শেষ হইলে কিশোরী বলিল—"আমি ধীবর কন্যা, নদীতে বাস করাই আমার ব্যবসা; আমি ইহাতে কোন প্রকার ভীতা বা সঙ্কুচিতা হই নাই; কিন্তু আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিতা হইলাম যে আপনি একাকী কি জন্য এই ভীষণ নদীতে আসিয়াছেন, আপ-নার কি প্রাণের ভয় নাই?" বালিকার এই কথা শুনিয়া চন্দ্রশেখর বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহার মনোগত ভাব ব্যক্ত কারলেন।

ধীবর কন্যা তাঁহার কথায় হাস্য করিয়া বলিল, "ঠাকুর! দেখি-তেছি যে আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অনেক শাস্ত্র, তন্ত্র, প্রভৃতি অধ্যয়ন

করিয়াছেন; আপনি এই সামান্য রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতেছেন? আপনি কি জানেন না, যে জগন্মাতা ভগবতী প্রত্যেক নারীতে অংশরূপে অধিষ্ঠিতা? আপনার মা, পিতামহী, মাতামহী, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি এই পৃথিবীস্থ যাবতীয় নারীতে যে তিনি অংশরূপে বিরাজিতা তাহা কি আপনি জানিয়াও জানেন না? আবার যে প্রত্যেক পুরুষ দেহে, ভগবান মহাদেব অংশরূপে বিরাজিত, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছেন? ইহাতে যদি পাপ হইত তবে বিধাতা কিছুতেই সৃষ্টি করিতেন না। যান ঠাকুর! বাড়ী গিয়া স্ত্রীর সহিত স্বধর্ম্ম পালন করুন।"

ধীবর দুহিতার বাক্য শেষ হইলে, ব্রাহ্মণের ভ্রমান্ধকার দূর হইল। অল্প বয়স্কা ধীবর দুহিতার মুখ হইতে এই প্রকার সার গর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া চন্দ্রশেখর যারপরনাই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া এক লম্ফে ধীবর কন্যার নৌকায় গিয়া দুইহস্তে কিশোরীর পদযুগল ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন "মাতঃ! তোমার কথায় আমার মোহ ঘুচিয়াছে, ধীবর কন্যার মুখ হইতে এই প্রকার সারগর্ভ কথা কিছুতেই বাহির হইতে পারে না; তুমি অবশ্যই কোন দেবী, ছল করিয়া ভুলাইতে আসিয়াছ! তোমার সত্য পরিচয় প্রদান করিয়া আমাকে কৃতকৃতার্থ কর।" এই বলিয়া চন্দ্রশেখর ঐ রমণীর চরণদ্বয়ের উপর স্বীয় মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

ধীবর কন্যা ব্রাহ্মণের এই প্রকার আচরণে ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল "আমি অস্পৃশ্যা ধীবর কন্যা, তুমি ব্রাহ্মণ হইয়া কেন আমার পদদ্বয় মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া আমার অকল্যাণ করিতেছ, শীঘ্র আমার পদদ্বয় ত্যাগ কর।" এই বলিয়া দুইহস্ত দ্বারা ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে স্বীয় পদদ্বয় মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ কিছুতেই পদত্যাগ না করিয়া, গদ্গদ্ কণ্ঠে বলিলেন "আমার নিশ্চয়ই বিশ্বাস হইতেছে তুমি কোন দেবী। অভাগাকে ছল দ্বারা ভুলাইতে আসিয়াছ; তোমার প্রকৃত পরিচয় না পাইলে কিছুতেই তোমার পদযুগল ত্যাগ করিব না; এখনই তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব; তোমার ব্রহ্মহত্যা পাপ ঘটিবে।" রমণী কিছুতেই আত্মপরিচয় দিতে স্বীকৃতা হইলেন না; এই প্রকার অনেকক্ষণ গত হইলে পর, যখন চন্দ্রশেখর দেখিলেন, যে ইনি কিছুতেই আত্মপরিচয় দিবেন না, তখন আত্মনাশ করিবার জন্য নদী-মধ্যে ঝম্প দিয়া পতিত হইলেন।

তখন সেই রমণী বলিলেন, "বৎস চন্দ্রশেখর! আমি এতক্ষণ তোমার ভক্তি এবং দৃঢ়তা পরীক্ষা করিতেছিলাম; তুমি যাহাকে দিবারাত্রি ভক্তি সহকারে আরাধনা করিয়া থাক, আমি তোমার সেই উপাস্য দেবী। বৎস! আত্মনাশ করা মহাপাপ; তুমি গাত্রোত্থান কর!"

চন্দ্রশেখর অতীব আহ্লাদিত হইয়া দেবীর আদেশানুযায়ী সেই নৌকায় উঠিয়া ভক্তিভরে, তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। যাঁহাকে মনে মনে দিবারাত্রি চিন্তা করিয়া থাকেন, যাঁহার পদ পাইবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি, কঠোর যোগাবলম্বনে শত সহস্র বৎসর আরাধনা করিয়া থাকেন—আজ সেই দেবদুর্লভ চরণ দর্শন পাইয়া চন্দ্রশেখর পুনঃ পুনঃ সেই চরণে প্রণতি করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবী তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, বর দিতে চাহিলেন; চন্দ্রশেখর যুক্ত করে, দেবীর স্বরূপ দর্শন করিতে প্রার্থনা করিলে, তৎক্ষণাৎ দয়াময়ী স্বরূপ ধারণ করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

২

দেবী বলিলেন, "বৎস! আজ যে স্থানে তুমি আমার দর্শন প্রাপ্ত হইলে, আমার বরে অতি সত্বরই এই বিপুল জলরাশি সর্ব্ব শস্যময়ী মেদিনীতে পরিণত হইবে। এবং এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তুমিই রাজত্ব করিবে।"

চন্দ্রশেখর পুনঃ প্রণতি করিয়া বলিলেন,—"মাতঃ! যখন পূর্ব্বপুণ্য ফলে তোমার পবিত্র চরণ দর্শন পাইয়াছি তখন রাজ্যভোগে আর আমার বিন্দুমাত্র স্পৃহা নাই। কেবল এই বর দিও মা! যেন বারংবার আর এই পাপময়ী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু-যাতনা ভোগ করিতে না হয়। রাজ্যভোগে আমার কোন স্পৃহাই নাই; তবে এই কর মা! যেন এই নবাবিষ্কৃত ভূখণ্ড আমার নামে প্রসিদ্ধ হয়।" দেবী "তথাস্তু" বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন; চন্দ্রশেখরও বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। সেই নবাবিষ্কৃত ভূমিখণ্ড চন্দ্রশেখরের নামে "চন্দ্রদ্বীপ" বলিয়া প্রচারিত হইল।* চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধে আরও একটী গল্প প্রচলিত আছে।

"চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ যোগী কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। শিষ্যগণ মধ্যে রামনাথ দনুজমর্দ্দন দে নামক চন্দ্রশেখরের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। একদা এই সুগন্ধা নদীর মধ্যে সকলেই রাত্রিযোগে এক-নৌকার মধ্যে সুষুপ্ত আছেন, এমন সময় যোগীপুরুষ স্বপ্নে দেখিলেন, যেন জগদম্বা কালিকা আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন যে যেস্থানে যোগীর নৌকা রহিয়াছে, তাহার নিকটে তিনটী পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি জল নিমগ্নাবস্থায় আছে। তাঁহার প্রিয়শিষ্য দনুজমর্দ্দন কর্ত্তৃক ঐ

* District of Buckergunj, Page 73.

মূর্ত্তিত্রয়ের উদ্ধার হইলে, সত্বর এই বিশাল নদী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে পরিণত হইবেক।*

স্বপ্নান্তে চন্দ্রশেখর জাগ্রত হইলেন; অবশিষ্ট রাত্রি, আর নিদ্রা গেলেন না। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র, প্রিয় শিষ্য দনুজমর্দ্দনকে গোপনে কালীকার স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তদানুযায়ী কার্য্য করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। দনুজমর্দ্দন গুরুর আদেশানুসারে স্বপ্ন কথিত স্থানে ডুব দিলেন। প্রথমবার কাত্যায়ণীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি উঠাইলেন; গুরুদেব পুনরায় ডুব দিতে আদেশ করিলেন; দনুজ-মর্দ্দনও দ্বিতীয়বার মদনগোপালের মূর্ত্তি উঠাইলেন। গুরু আবার ডুব দিতে কহিলেন; কিন্তু দনুজমর্দ্দন আর ডুব দিতে সাহসী হইলেন না। তৃতীয়বার ডুব দিলে লক্ষ্মীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি পাওয়া যাইত।*

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "ভগবতী কালিকার প্রসাদে এই বিশাল জলরাশি সর্ব্ব শস্যময়ী পৃথিবীতে পরিণত হইবেক, এবং ভবানীর আদেশ ক্রমে:তোমাকে এই জনপদের রাজা হইতে হইবেক। তৃতীয় বার ডুব না দিয়া অতিশয় অবিমৃষ্যকারিতার কার্য্য করিয়াছ।" †

এই দনুজ মর্দ্দন দে। চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যস্থাপয়িতা। ইনি গুরুর নামে নূতন রাজ্যের নামাকরণ করেন। তাই এই স্থান চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া বিখ্যাত। কেহ কেহ বা বাকলা চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া থাকেন; কিন্তু আমি যত অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় বাকলা, চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পরগণামাত্র।

---

* কাত্যায়নী, এবং মদনগোপালের পাষাণ নির্ম্মিত মূর্ত্তি মাধব পাশার রাজ বাড়ীতে এখনও বর্ত্তমান আছে।

† District of Backergunj page 73.

দনুজ মর্দ্দন রাজোপাধি ধারণ করিয়া কচুয়া * নামক স্থানে প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। দনুজ মর্দ্দনের প্রপৌত্র কৃষ্ণবল্লভের কোন পুত্রসন্তান ছিল না; কিন্তু তাঁহার সর্ব্বগুণ সম্পন্না কমলানাম্নী এক কন্যা ছিল। পিতার মৃত্যুর পর এই কমলা স্বামীর সহিত রাজত্ব শাসন করিতে থাকেন। এই কমলা অনেকগুলি সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। অতিথিশালা, পান্থনিবাস প্রভৃতি ব্যতীতও তিনি অতিশয় বৃহতী এক দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি স্থানীয় অধিবাসিগণ সেই দীঘিকে "রাণী কমলার দীঘি" বলিয়া থাকে। এই দীর্ঘিকা খনন সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়।

রাণী কমলার মৃত্যুরপর পরমানন্দ বসু রায় রাজ্যাভিষিক্ত হন। শ্রীযুক্ত বেভারিজ সাহেবের ইতিহাসে প্রকাশ যে এই পরমানন্দ রায় রাজা কৃষ্ণ বল্লভের অন্যতম দৌহিত্র সন্তান; কিন্তু মাধবপাশার রাজবাড়ীর বংশ তালিকায় প্রকাশ যে পরমানন্দ রায় রাণী কমলার পুত্র।

রাজা পরমানন্দ রায়ের পৌত্র কন্দর্পনারায়ণ কচুয়া হইতে রাজধানী উঠাইয়া, মাধবপাশা গ্রামে স্থাপন করেন। কেহ বলেন যে নদী অত্যন্ত প্রবল হইয়া রাজধানী আক্রমণ করিবার উপক্রম করাতে রাজা, তথা হইতে অন্য স্থানে রাজধানী স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাজা কন্দর্প নারায়ণ হইতে ক্রমাগত রামচন্দ্র, কীর্ত্তিনারায়ণ, বাসুদেব প্রতাপ নারায়ণ ও প্রেম নারায়ণ রাজত্ব

---

* পটুয়াখালী সবডিভিসনের মধ্যে বাউফল থানার অন্তর্গত তেতুলীয়া নামক নদীর পশ্চিম পারে কচুয়া গ্রাম। এই স্থানে অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ অনেক বিদ্যমান আছে। স্থানীয় লোকে ইহাকেই রাজবাড়ী কহে। এখন সেই রাজবাড়ীর অনেক অংশ নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

করেন। প্রেম নারায়ণের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। সুতরাং তাঁহার জামাতা রাজা গৌরীচরণ মিত্র রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। গৌরীচরণ মিত্র হইতে ক্রমাগত উদয়নারায়ণ, শিবনারায়ণ, লক্ষ্মী নারায়ণ, জয়নারায়ণ, নরসিংহ নারায়ণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা জয়নারায়ণ রায়ের রাজত্ব সময় ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বাকী রাজস্ব জন্য সমস্ত চন্দ্রদ্বীপ পরগণা নীলামে বিক্রীত হইয়া যায়। সেই সময় হইতে মাধবপাশা রাজবংশের অতিশয় শোচনীয় অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত বীরসিংহ নারায়ণ রায় অতিশয় ধার্ম্মিক এবং সাধু। রাজধানীর চতুঃপার্শ্বস্থ লাখারাজ (নিষ্কর) জমির সামান্য আয় দ্বারা এখন এই রাজবংশের গ্রাসাচ্ছাদন হইয়া থাকে। বর্ত্তমান ছোটলাট বাহাদুর সার চার্লস্‌ইলিয়ট্ মহোদয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক, রাজা বীরসিংহের একমাত্র পুত্রকে পাতার হাটের সবরেজেষ্টর নিযুক্ত করিয়া নিরুপায় রাজ পরিবারের জীবন রক্ষার কতক উপায় করিয়া দিয়াছেন। রাজবাড়ীর বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সমূহের অনেকগুলি জীর্ণ, সংস্কারাভাবে ভূমিসাৎ হইয়াছে। বিপন্ন রাজ পরিবার অতি কষ্টে, দুই একটী প্রকোষ্ঠ মেরামত করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। প্রাচীন রাজগণের কীর্ত্তি মধ্যে বর্ত্তমান সময় কতকগুলি বৃহৎ জলাশয় দেখিতে পাই; তন্মধ্যে "দুর্গাসায়র" অথবা "দুর্গাসাগর" সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।





সেলিমাবাদ। *

যৎকালে চন্দ্রদ্বীপের বিশাল ভূমিখণ্ড, সর্ব্বশস্যময় রাজ্যে পরিণত তখন তাহার পশ্চিমে তদধিক এক বিশাল ভূমিখণ্ড অনুর্ব্বর অবস্থায় পতিত ছিল। ইহাই সেলিমাবাদ। চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসে প্রকাশ, যে সেলিমাবাদ প্রভৃতি এই জেলার যাবতীয় পরগণা চন্দ্রদ্বীপ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে; আমি অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে যে চন্দ্রদ্বীপ হইতে ন্যূনাধিক ৫০ পঞ্চাশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণা বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা সত্য, কিন্তু তন্মধ্যে সেলিমাবাদের নাম দেখিতে পাই না। সুতরাং সেলিমাবাদ একটী স্বতন্ত্র পরগণা হইবারই সম্ভব। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের কোন কীর্ত্তি কলাপ, সেলিমাবাদে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেলিমাবাদ, চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্গত হইলে অবশ্যই কোন না কোন চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিত। আরও বিশেষ যে, চন্দ্রদ্বীপ পরগণার সৃষ্টির অনেক পরে এই পরগণা লোকালয়ে পরিণত হইয়াছে। শুনিয়াছি যে, সেলিমাবাদ পরগণার অনেক স্থান বৃহৎ বৃহৎ সুন্দরী এবং অন্যান্য বৃক্ষরাজীতে পরিণত ছিল। চন্দ্রদ্বীপ পরগণার ন্যায় এই পরগণার নাম সেলিমাবাদ কেন হইল, তদ্বিষয়ে নানাকথা প্রচলিত আছে! ব্লক মেন সাহেব তাঁহার গ্রন্থে বলেন যে, পূর্ব্বে এই পরগণার নাম সুলইমানাবাদ ছিল। সুলইমান নামক কোন প্রধান মুসলমান রাজপুরুষ, তৎকালে মুরশিদাবাদে রাজত্ব করিতেন; তাঁহার নামানুকরণে এই ভূখণ্ডের

নাম রাখা হইয়াছিল। নবাব স্থলইমান, বাদসাহ-পুত্রের গৌরব বাড়াইবার জন্য তাঁহারই নামে, ঐ পরগণার নাম রাখেন। তৎকালে সম্রাট আকবর সমগ্র ভারতের অধিপতি ছিলেন।

পাঠান বিদ্রোহ দমনার্থ যুবরাজ সেলিম (জাহাঁঙ্গীর) বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়া বিদ্রোহ দমন করতঃ তথায় শাসনকর্ত্তাভাবে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে তাঁহারই অনুজ্ঞাক্রমে, বঙ্গদেশের অনেক পতিত এবং জঙ্গল পরিপূর্ণ স্থান আবাদ হইয়া যায়। যে যে স্থান তৎকর্ত্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলিতেই তাঁহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই পরগণা তন্মধ্যে একটী। স্থতরাং এই ঘটনার সহিত যখন ঐতিহাসিক ঘটনার অনেক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইহাই অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য। স্থূল কথা এই সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব জানিতে পারি নাই।

উল্লিখিত ঘটনার অনেক পরে আগাবাখর নামক জনৈক মুসলমান রাজপুরুষ নবাবের নিকট হইতে বোজরগ মেদপুর নামক পরগণার সনন্দ গ্রহণ করিয়া এই দেশে আগমন করেন। তিনি সেলিমাবাদ পরগণার কতক অংশ বলপূর্ব্বক দখল করিয়া নিজ নামে এক "গঞ্জ" অর্থাৎ হাট স্থাপন করেন। তাঁহারই নামে এই সমগ্র জেলার নাম হইল। প্রায় ৮০ ৮৫ বৎসর পূর্ব্বে বাখরগঞ্জেই "সদর" ছিল। বর্ত্তমান সময় "বরিশাল" নামক স্থানে জেলা উঠিয়া আসিয়াছে।

সেলিমাবাদের সমগ্র ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে; তবে এই গ্রন্থের সহিত এই পরগণার বিশেষ সম্বন্ধ থাকাতে যতদূর আবশ্যক বোধ করি, তাহারই উল্লেখ করিতে হইবে।

সেলিমাবাদ পরগণার মধ্যে রায়েরকাঠির রাজবংশ অতিশয় সম্মানিত; চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের সহিত তুলনা করিতে গেলে, এই রাজবংশ তাঁহাদের অপেক্ষা সম্মানে কোন প্রকারে হীন নহে। আমার এই গ্রন্থ সম্বন্ধে এই রায়ের কাঠির রাজবংশের অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; সুতরাং এই রাজ্য স্থাপয়িতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিয়া আমার এই ভূমিকা সমাপ্ত করিব।

কলিকাতার সন্নিহিত দেবগঙ্গা গ্রামে শাত্রাজিৎ রায় * (কেহ বা শত্রাজিৎ রায় বলেন) নামক এক ধার্ম্মিক কায়স্থ সন্তান বাস করিতেন। সর্ব্বদা সত্যালাপ, ধর্ম্মচর্চ্চা, ব্রাহ্মণ ও দেব-সেবা ব্যতীত শত্রাজিৎ রায়ের অন্য কার্য্য ছিল না। তিনি অতিশয় নিঃস্ব ছিলেন, কোন প্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। একদা রাত্রিযোগে স্বপ্ন দেখিলেন যে, ভগবতী কালীকা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন। শত্রাজিৎ স্বপ্নাবস্থায় জগন্মাতাকে অনেক স্তব স্তুতি করিলেন। দেবী আদেশ করিলেন যে, বলেশ্বর নদীর পূর্ব্ব প্রান্তে এক বিশাল ভূমি-খণ্ড জঙ্গলাবস্থায় পতিত আছে, তথায় ভগবতীর দশভূজামূর্ত্তি কোন এক বৃক্ষতলায় মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত আছে। তিনি ঐ দেশে গমন

* শ্রীযুক্ত বেভারিজ সাহেবের ইতিহাসের সহিত রায়েরকাঠির রাজবংশের স্থাপয়িতার নাম সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ দেখিতে পাই। শ্রীযুক্ত অদ্বৈতনারায়ণ রায় বলেন, যে শত্রুজিৎ রায় কর্ত্তৃক, তাঁহাদের রাজ্য স্থাপিত হয় নাই। শ্রীরাম রায় নামক এক জন, প্রথমতঃ দেবগঙ্গা গ্রাম হইতে, এই প্রদেশে আগমন করিয়া নিজ শৌর্য্যগুণে বর্ত্তমান রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্বপ্ন বৃত্তান্ত তিনি অস্বীকার করেন। সাহেববাহাদুরের ইতিহাসে, শত্রাজিৎ কর্ত্তৃকই "রায়েরকাঠির রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এই দুইটী ঘটনার সত্যাসত্য সম্বন্ধে পাঠক নিজে বিবেচনা করিবেন।

পূর্ব্বক দেবীমূর্ত্তি উদ্ধার করিলে, ভগবতীর কৃপায় ঐ বিশাল বনভূমি সমৃদ্ধ লোকালয়ে পরিণত হইবে। শত্রাজিৎ দেবীর বরে ঐ রাজ্যে রজত্ব করিতে পারিবেন।

শত্রাজিৎ দেবীর আদেশ ক্রমে সেই হিংস্র জন্তুর আবাস ভূমিতে আগমন পূর্ব্বক্ক, দেবী মূর্ত্তি উদ্ধার করিলেন।* ভগবতীর বরে অতি শীঘ্র ঐ বিশাল কানন ভূমিতে সমৃদ্ধ জনপদের সৃষ্টি হইল, শত্রাজিৎ রাজোপাধি ধারণ করিয়া ঐ স্থানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

মহারাজ জয়নারায়ণ রায়ের রাজত্ব সময় এই পরগণা অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। তিনি অনেকগুলি দেবমন্দির এবং জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অনেকটার উপর তাঁহার নাম, প্রতিষ্ঠার সন তারিখ সংস্কৃত ভাষায় লেখা আছে।



* দেবীমূর্ত্তি এখনও রাজ বাড়ীতে আছে।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

(৺ দুর্গাদাস সেন হইতে রামেশ্বর সেন পর্য্যন্ত)

৺ দুর্গাদাস সেনই আমাদের বংশের আদিপুরুষ। শুনিয়াছি ইহার পূর্ব্ব নিবাস বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত পোরাগাছা গ্রামে ছিল। রুনসী নিবাসী ৺ হরেকৃষ্ণ রায় মহাশয় ভগ্নীর বিবাহ দিয়া ইহাকে কীর্ত্তিপাশা গ্রামে স্থাপন করেন। ৺ দুর্গাদাসের পিতা পিতামহ প্রভৃতির কোন ইতিহাস জানিতে পারা যায় নাই। অদ্য হইতে প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া এই গ্রামে স্বীয় বাসস্থান স্থাপন করেন। ৺ দুর্গাদাসের জীবনের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না; তবে আমার প্রাচীন জ্ঞাতি মহাশয়গণ প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে তিনি জাতীয় ব্যবসা দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয় হইতেও সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। রুনসীর রায় বংশ পূর্ব্বে অতিশয় সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। দুর্গাদাস সেন বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া কয়েক বৎসর শ্বশুরালয়ে বাস করিয়াছিলেন; শেষে রায় মহাশয়দের যত্নে, দুর্গাদাস স্বতন্ত্র বাড়ী নির্ম্মাণ করতঃ সস্ত্রীক স্বাধীন ভাবে সংসার যাত্রা

নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি তিনি নাকি অতিশয় সদাশয় লোক ছিলেন; চিকিৎসা দ্বারা কোন উৎকট রোগ-প্রতিকার করিলে রোগী অথবা তাঁহার আত্মীয় স্বজন অধিক পুরস্কার দিতে চাহিলে তিনি গ্রহণ করিতেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "আমি আমার স্ত্রী ও এক পুত্র ইহা ব্যতীত সংসারে আমার আর কেহ নাই। অধিক লইয়া কি করিব! অধিক ধনে দস্যু তস্করের ভয় বৃদ্ধি হয়; আরও বিশেষ ধন লোভে চিত্ত কলুষিত হয়। যাহা একান্ত আবশ্যক তাহাই লইব।" তাঁহারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। সংসার ধর্ম্মে দুর্গাদাসের বড় মতি গতি ছিল না, সর্ব্বদাই ইষ্টমন্ত্র জপ, দেব সেবা ও অতিথি সেবা করিতেন। যাহা উপার্জ্জন করিতেন, গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ রাখিয়া আর সমুদয় দীন দরিদ্র এবং ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বামীর সংসারের উপর এইরূপ বীতশ্রদ্ধা দেখিয়া তাঁহাকে সময়ে সময়ে এরূপ করিতে নিষেধ করিতেন। দুর্গাদাস সহাস্যবদনে বলিতেন, "যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই একটা সংস্থান করিয়া দিবেন। দেখ ভগবান বৃক্ষকোটরে যে সমস্ত কীট সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারাও উপযুক্ত আহারাদি দ্বারা শরীর রক্ষা করিয়া আসিতেছে। পৃথিবীতে কেহ চিরকাল থাকিতে আসে নাই; নিজে উপার্জ্জন করিয়া কাঙ্গাল দুঃখীদের উপকার করিতে না পারিলে সে উপার্জ্জনে ধিক্। নিজে কষ্ট পাইয়াও অন্যের দুঃখ দূর করাই মহান্ ধর্ম্ম। তুমি আমার সহধর্ম্মিণী হইয়া কোথায় আমার এই সমস্ত সৎকার্য্যের সহায়তা করিবে না আরও আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে আসিয়াছ।" তাঁহার সহধর্ম্মিণী আর কোনও কথা কহিতেন না।

দুর্গাদাস মধ্যাহ্ন সময়ে স্নানাহ্নিক সমাপনান্তর আহার করিতে

যাইবেন, এমন সময়ে কোন ক্ষুধার্ত্ত অতিথি, তাঁহার নিকট আগমন করিলে, তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভোজ্য বস্তু, অতিথিকে প্রদান করিয়া স্বয়ং উপবাসী থাকিতেন। এই প্রকার প্রায়ই হইত। অবশেষে দুর্গাদাস আহার করিবার পূর্ব্বে তৎপুত্র রাম জীবন, কেহ অভুক্ত অতিথি আছেন কিনা, নিকটবর্ত্তী স্থানে অনুসন্ধান করিয়া আসিলে তিনি আহার করিতেন।

দুর্গাদাসের মৃত্যু বড়ই আশ্চর্য্য জনক, শুনিয়াছি যে বিনা ব্যাধিতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন, স্বীয়পুত্র রাম জীবনকে বলিলেন,—"বৎস রামজীবন! আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় আমার মৃত্যু হইবে, তুমি অদ্য বাড়ী হইতে কোথাও যাইও না।" প্রকৃত পক্ষে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্তও তাঁহার কোন প্রকার ব্যাধি দৃষ্ট হইল না। সেই প্রাতঃকাল হইতে, সমাধি অবস্থায় উপবিষ্ট রহিলেন। সমাধির পূর্ব্বে পুত্রকে "নারায়ণ ক্ষেত্র" এবং অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। রামজীবন, তাঁহার গর্ত্ত-ধারিণী এবং তাঁহার স্ত্রী অভুক্তাবস্থায়, দুর্গাদাসের নিকট বসিয়া-ছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুর্গাদাস বলিলেন, "আমার সময় হইয়া আসিয়াছে, আমাকে এখন বাহিরে নাও।" মাতা পুত্র ধরাধরি করিয়া নারায়ণ ক্ষেত্রে লইয়া গেলেন। ঠিক সন্ধ্যার সময় দুর্গাদাসের মহাপ্রাণ স্বর্গে চলিয়া গেল।* সাধ্বী পত্নী স্বামীর মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া এক চিতায় স্বর্গে গমন করিলেন।

কত বৎসর বয়সে দুর্গাদাসের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা কেহই

* আমার অন্যতম জ্ঞাতিপ্রবর ৺ শম্ভুচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি।

বলিতে পারেন না। তবে তাঁহার জীবনের যেটুক পাইয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, যে তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন।

দুর্গাদাসের পুত্র রামজীবন পিতামাতার মৃতুর সময়ে সংসার রক্ষণে উপযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি পিতার ন্যায় অতদূর উদার-চেতা এবং পরদুঃখ-কাতর না হইলেও নিতান্ত হীন ছিলেন না। ইনিও পিতার নিকট চিকিৎসা শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। তিনি পিতার ন্যায় মুক্তহস্ত ছিলেন না; অর্থোপার্জ্জনে তাঁহার সাতিশয় স্পৃহা ছিল, সময়ে সময়ে অর্থোপার্জ্জন জন্য দূর-দেশেও যাইতেন।

রামজীবনের জীবনের বিশেষ কোন ঘটনা জানিতে পারা যায় নাই; তবে তিনি পিতার ন্যায় জাতীয় ব্যবসা দ্বারা পরিবার প্রতি-পালন করিতেন; এবং পিতার ন্যায় দেবদ্বিজসেবায় তাঁহার ভক্তি ছিল। পরদুঃখ দূর করিতে তিনি পিতার ন্যায় মুক্তহস্ত না হইলেও যথাসম্ভব দান করিয়া বিপন্নকে উদ্ধার করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠের নাম রামগোপাল। তিনি পিতাপিতামহের ন্যায় সরল-প্রকৃতি এবং উদার-চরিত্র লোক ছিলেন না; কিন্তু রামেশ্বরের সেই সমস্তগুলি বর্ত্তমান ছিল। ইনি অতিশয় সদাশয়, ধার্ম্মিক, মিষ্টভাষী এবং পরোপকারী ছিলেন। সংস্কৃতভাষায় ইঁহার যে প্রকার ব্যুৎপত্তি ছিল, চিকিৎসা বিদ্যায়ও সেই প্রকার পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ রামগোপাল একজন মুসলমান মৌলবীর নিকট পার্সিভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ যে প্রকার সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন ইনি পার্সিভাষায় তদ্রূপ বিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না। রামেশ্বর পিতৃপিতামহের ব্যবসা দ্বারা স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছিলেন, কিন্তু রামগোপালের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে

জ্ঞান না থাকাবশতঃ চাকরী দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল।

রামেশ্বর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিশয় শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করিতেন, কিন্তু রামগোপাল কনিষ্ঠের শ্রদ্ধায় সুখী ছিলেন না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী অতিশয় ক্রুর প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন। রামগোপালের চাকরী দ্বারা বিলক্ষণ দশটাকা আয় হইত, সুতরাং রামগোপালের স্ত্রী সর্ব্বদা রামগোপালকে পৃথগন্ন হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেন। পিতা জীবিত থাকার জন্য সেই আশা সফল হয় নাই। এদিকে রামজীবনের পরলোক প্রাপ্তি হইবার অব্যবহিত পরে, রামগোপাল কনিষ্ঠকে ডাকিয়া পৈত্রিক স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি বিভাগ করিতে বলিয়া পৃথগন্ন হইতে চাহিলেন। কনিষ্ঠ রামেশ্বর জ্যেষ্ঠের কথায় অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া প্রথমতঃ অস্বীকৃত হইলেন। ভাবিলেন যে বুঝি দাদা ব্যঙ্গ করিতেছেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই জানিতে পারিলেন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠের অন্তঃকরণে দারুণ বিদ্বেষ-বহ্নি প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ভস্মসাৎ করিতে উপক্রম করিয়াছে, তখন অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহার সহিত পৈত্রিক সম্পত্তির যথাযথ বিভাগ করিয়া উভয়েই পৃথক্ হইলেন।

রামেশ্বর ভ্রাতার সহিত পৃথক্ হইয়া স্বীয় উপার্জ্জন দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। রামগোপালের আয় ভ্রাতার আয় অপেক্ষা অধিকতর ছিল, সুতরাং তিনি সুখস্বচ্ছন্দের সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

রামগোপালের রামকেশব নামক একটী পুত্র জন্মিল; এবং রামেশ্বর যথাক্রমে কাশীরাম, কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম এবং বলরাম নামক চারি জন মহা বিচক্ষণ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন।

রামকেশব পিতার মৃত্যুর পর পৈত্রিক চাকরীর অধিকারী হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত নিতান্ত অসদ্ভাবে ছিলেন না। রামকেশবের রমাপতি নামক এক পুত্র জন্মে, এবং তাঁহার যে পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম রাজকৃষ্ণ সেন। শুনিয়াছি যে রাজকৃষ্ণ বাঙ্গালা এবং পার্সিভাষায় পণ্ডিত হইয়া ঢাকায় চাকরী করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণের পুত্র রঘুনাথ সেন, রায়েরকাঠি চাকরী করিয়া স্বনামে কয়েকখানি তালুক সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার দুই পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠের নাম চন্দ্রনাথ, কনিষ্ঠের নাম ঈশ্বরচন্দ্র। চন্দ্রনাথ আমার খুল্লপিতামহ হইতেন, আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। বাঙ্গালা লেখা পড়ায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আমার স্বর্গীয় জনক মহাশয়ের সময় তিনি আমাদের মফস্বলে চাকরী করিতেন। চন্দ্রনাথের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ঈশ্বরচন্দ্র ভ্রাতার স্থলে স্বয়ং কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সংপ্রতি তিনি নানা প্রকার পীড়ায় কাতর হইয়া বাড়ীতেই আছেন। পৈত্রিক বিত্তের অধিকাংশই বাকী খাজানা এবং দেনায় নীলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। আমাদের ষ্টেট হইতে তাঁহাকে যে পেন্‌সন্‌ দেওয়া হয়, ইহা এবং ক্ষুদ্র তালুকের যৎ সামান্য আয় দ্বারা অতি কষ্টে তাঁহার সংসার নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। চন্দ্রনাথের এক পুত্র জীবিত আছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কোন পুত্র সন্তান নাই, এক কন্যা সন্তান বর্ত্তমান আছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে রামেশ্বর সেনের যথাক্রমে কাশীরাম, কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম এবং বলরাম নামক চারি জন পুত্র জন্মিয়াছিল। ভ্রাতৃগণ মধ্যে সকলের সহিত সকলের সদ্ভাব ছিল না। প্রথম কাশীরাম তিন ভ্রাতাকেই স্নেহ করিতেন, দ্বিতীয় কৃষ্ণরাম দাদাকে অত্যন্ত ভক্তি এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বিষ্ণুরাম সেন অত্যন্ত

উদ্ধত এবং নিষ্ঠুরপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার সহিত, কোন ভ্রাতারই সৌহৃদ্য ছিল না। সর্ব্বকনিষ্ঠ বলরাম বিষ্ণুরামের ন্যায় অত্যন্ত উদ্ধত না হইলেও অত্যন্ত ক্রূর ছিলেন। রামেশ্বরের মৃত্যুর পর সকল ভ্রাতাগণই পরস্পর পৃথগন্ন হইয়া পৈত্রিক বাসভূমি পরিত্যাগকরতঃ প্রত্যেকে এক এক খানি পৃথক বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃগণ সকলেই চাকরী করিতেন। কাশীরাম সেন চাকরী করিতেন কি না জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম, বলরাম এই তিন ভ্রাতাই রায়েরকাঠির মহারাজা জয়নারায়ণ রায়ের চাকরী করিতেন। কৃষ্ণরাম স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে একেবারে সর্ব্বপ্রধান দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া রাজত্বের ক্রমোন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃগণ মধ্যে কৃষ্ণরাম সেনই অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। বিষ্ণুরাম এবং বলরাম উভয়েই স্ব স্ব নামে তালুক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণের অবস্থা যদিও এখন ততদূর সচ্ছল নহে, এবং তাঁহাদের পৈত্রিক বিত্ত মধ্যে কতকাংশ হস্তান্তরিত হইয়াছে, তথাপি কেহ কেহ পৈত্রিক বিত্তের অধিকারী হইয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতেছেন।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণরাম সেন।

এই মহাপুরুষ যে কোন্ সনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে ইহার সন্তান সন্ততির জন্ম এবং মৃত্যু তারিখে যতদূর অনুমিত হয়, তাহাতে বোধ হয় যে তিনি ১০৯৫ সালে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে কৃষ্ণরাম রায়েরকাঠির রাজা জয়নারায়ণের দেওয়ানী কার্য্য করিতেন। অন্যান্য ভ্রাতৃগণও রাজ সরকারে কর্ম্ম করিতেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণরাম সকল হইতেই বিদ্যা, বুদ্ধি, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি সদ্গুণের শ্রেষ্ঠতায়, রাজ সরকারে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

রাজা জয়নারায়ণের রাজত্বের প্রারম্ভে বঙ্গদেশে বর্গীর (মহারাষ্ট্রা) হাঙ্গাম হইয়াছিল। স্বয়ং আলিবর্দ্দি খাঁ সেনানায়ক হইয়া তাহাদিগকে অনেক যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তথাপি দুর্ব্বৃত্তগণ সময়ে সময়ে গ্রামের মধ্যে সদলে সহসা উপস্থিত হইয়া লুটপাট করিয়া পলায়ন করিত। সেলিমাবাদেও তাহারা আগমন করিয়া কোন কোন গ্রাম

ধ্বংস করিয়াছিল। অনেক গ্রামের প্রাচীনগণের মুখে "বর্গীর হাঙ্গাম" এখনও শুনা যায়। এই জেলার অন্তর্গত পোনাবালিয়া গ্রামে, মহারাট্টাগণের সহিত তত্রত্য জমীদার মহাশয়ের সহিত এক যুদ্ধ হইয়াছিল।* বর্গীদিগের পুনঃ পুনঃ অতর্কিত আক্রমণে সেলিমাবাদ পরগণার অনেক সম্পত্তিশালী গৃহস্থ একেবারে নিঃস্ব হইয়াছিলেন; অনেকে প্রাণ ও মান ভয়ে ভীত হইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছিলেন। মহারাজ জয়নারায়ণের রাজত্ব হইতে এই প্রকার অনেক প্রজা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে, প্রচুর রাজস্ব বাকী পড়িয়া যায়।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই বঙ্গদেশে বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল; মহারাষ্ট্র দস্যুগণের উৎপীড়নে নগর গ্রাম, উৎসন্ন হইতেছিল, রাজা জয়নারায়ণের প্রভূত রাজস্ব বাকী পড়িয়া গেল, তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও বাকী রাজস্ব দিতে পারিলেন না। এদিকে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বাহাদুরের অদম্য সাহসে এবং অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্যে মহারাষ্ট্র দস্যুগণ পরাস্ত হইল। কিন্তু তাহারা পলায়িতভাবে অবস্থান করিয়া অকস্মাৎ গ্রাম, নগর লুটপাট করিয়া পলায়ন করিত। অবশেষে আলিবর্দ্দি খাঁ তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রগণের সহিত ক্রমান্বয়ে যুদ্ধে নবাব বাহাদুরের রাজকোষ প্রায় অর্থশূন্য হইয়াছিল। তাঁহার অধীনস্থ শাসন কর্ত্তৃগণের প্রতি রাজস্ব আদায় করিবার জন্য তাগিদ পরওয়ানা বাহির হইল।

নিবাইস মহম্মদ নামক জনৈক রাজপুরুষ তখন ঢাকার শাসন কর্ত্তা ছিলেন। তিনি অতিশয় উন্নতমনা, ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী ব্যক্তি

* Ram Bhadra Rai is said to have fought with the Maharattas or Bargis, and to have defeated them near Ponabalia.
District of Buckergunj, page 124.

† Stuart's History of Bengal. Page 302.

ছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে তদধীনস্থ প্রজাবর্গ সর্ব্বদা নানা সুখ এবং শান্তিতে বাস করিত। খাজানা আদায়ের পরওয়ানা প্রাপ্ত হইয়া নিবাইস মহম্মদ সমস্ত ভূম্যধিকারিগণের নিকট টাকা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বর্গীর হাঙ্গামা হেতু রাজা জয়নারায়ণের দেয় প্রচুর রাজস্ব বাকী পড়িয়াছিল। তখন যে তিনি বাকী টাকার এক চতুর্থাংশও দিতে পারেন, এমত ক্ষমতা ছিলনা। সুতরাং তিনি ধৃত হইয়া ঢাকার শাসনকর্ত্তা-সম্মুখে নীত হইলেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুকম্পায় আজকাল ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী হইতে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা পর্য্যন্ত সকলেরই আইনত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব স্ব প্রাপ্য খাজানা আদায় করিয়া লইতে হয়; কিন্তু মুসলমান রাজার রাজত্ব সময় এই প্রকার নিয়ম ছিল না; তৎকালীন ভূম্যধিকারিগণ প্রজা ভূম্যধিকারী আইনের (Bengal Tenancy Act) কোন ধার ধারিতেন না। খাজানা বাকী পড়িলে প্রজাকে ধৃত করিয়া আনিয়া স্ব স্ব প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লইতেন। নবাবও যেমন স্বীয় অধীনস্থ ভূম্যধিকারিগণের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিতেন, আবার তাঁহারাও প্রজাগণের নিকট হইতে সেই প্রকারে টাকা আদায় করিয়া লইতেন।

রাজা জয়নারায়ণ খাজানা বাকীর দায়ে ধৃত হইয়া শাসনকর্ত্তা নিবাইস মহম্মদ সদনে আনীত হইলেন। কিন্তু তখন তাঁহার এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে সমগ্র টাকা আদায় করা দূরে থাকুক, অন্ততঃ এক চতুর্থাংশও দিতে পরিলেন না, সুতরাং খাজানা আদায় করিবার জন্য রাজানুচরগণ অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি যে রাজা অত্যন্ত পুতিগন্ধময় কারাবাসে, অনাহারে, অনিদ্রায়

কালাতিপাত করিয়াছিলেন। প্রহরিগণ সময়ে সময়ে রাজাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিত। অত্যন্ত যন্ত্রণায় মহারাজের শরীর অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়াছিল। এমন কি তাঁহার পূর্ব্বশ্রী নষ্ট হইয়া একেবারে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে যেমন খাজানার ডিক্রী হইলে বাকীর ভূমি নিলাম বিক্রয় দ্বারা টাকা আদায় করা হয়, অথবা ভূমি খরিদ করিয়া টাকা শোধ লওয়া হয়, তৎকালে সে প্রকার পদ্ধতি ছিল না। নবাবের অধীনস্থ ভূম্যধিকারিগণ রাজস্ব দিতে অশক্ত হইলে, স্ব স্ব জমিদারী ইস্তাফা দিলেই খাজনার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেন। জয়নারায়ণও যাতনা সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া জমিদারী ইস্তাফা দিয়া প্রাণ বাঁচাইবার মনন করিলেন। তিনি জনৈক প্রহরী দ্বারা তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় শাসনকর্ত্তা সমীপে জানাইলেন। নিবাইস মহম্মদ জানিতেন না যে রাজা জয়নারায়ণ এতদূর কায়ক্লেশে কারাগার মধ্যে বন্দী আছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজাকে কারাগার হইতে আনাইয়া দেখিলেন যে নিদারুণ শারীরিক পীড়নে, রাজার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইয়াছে। নিবাইস মহম্মদ রাজার কারাগারের কারণ জিজ্ঞাসা করায় রাজা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিলেন। নিকটে খাজানা আদায়ের বক্সি ছিলেন, তিনি বলিলেন, "জাহাঁপনা! রাজা জয়নারায়ণের দেয় রাজস্ব অনেক দিন পর্য্যন্ত বাকী পড়ায়, হুজুরের আদেশক্রমে, ইহাঁকে ধৃত করিয়া আনিয়াছি। ইনি বলিলেন যে খাজানা এখন কিছুতেই দিতে পারিবেন না। এদিকে মুরশিদাবাদ হইতে হুজুরের নিকট খাজানা আদায়ের যে প্রকার পরওয়ানা জারি হইয়াছে, তাহা অবগত আছেন, এখন আপনার যে প্রকার অভিপ্রায়।"

শাসনকর্ত্তা জয়নারায়ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তিনি নতজানু

হইয়া তস্‌লিম করতঃ যুক্তকরে বলিলেন,—"জাহাপনা! মহারাষ্ট্র দস্যুদের উৎপাতে আমার জমিদারীর অনেকাংশ প্রায় ধ্বংসাবশেষ হইয়াছে। নবাব বাহাদুরের বাহুবলে যদিও তাহারা দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া থাকুক, তথাপি তাহারা সময়ে সময়ে অতর্কিতরূপে নিঃসহায় গ্রামবাসীদের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া গ্রাম, নগর ভস্মসাৎ করিতেছে। এজন্য রাজস্ব বাকী পড়িয়াছে; এখন যে সমগ্র রাজস্ব প্রদান করিতে পারি এরূপ সাধ্য নাই;" এই বলিয়া জয়নারায়ণ কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান রহিলেন।

নিবাইস মহম্মদ জয়নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক দয়ার উদ্রেক হইল, তিনি বলিলেন "কোন্ পর্য্যন্ত রাজস্ব দিতে পার?"

জয়নারায়ণ বলিলেন,—"হুজুরের অভিপ্রায় হইলে দুই বৎসরের মধ্যে সমস্ত টাকা আদায় করিতে সক্ষম হইব। আরও"—তাঁহার বাক্য সমাপ্তি হইবার পূর্ব্বেই, জনৈক পারিষদ করযোড়ে বলিলেন,—"জাহাঁপনা! বর্গীদের অত্যাচার বঙ্গ, বেহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি সমস্ত স্থানেই হইয়াছে। কিন্তু ভূম্যধিকারিগণের দেয় রাজস্ব এক কপর্দ্দকও বাকি নাই, কেবল সেলিমাবাদের ভূম্যধিকারীরই রাজস্ব বাকী, হুজুরের অভিপ্রায় হইলে বাকী রাজস্ব অন্যের নিকট আদায় হইতে পারে।

নিবাইস মহম্মদ বলিলেন,—"জয়নারায়ণ! রাজার রাজস্ব আদায় করিতে না পারিলে জমিদারী রক্ষা হয় না। তুমি এই টাকা আদায় করিতে অশক্ত হইলে জমিদারী ছাড়িয়া দাও।"

অত্যন্ত প্রহারে, অনাহারে, মানসিক দুশ্চিন্তায় রাজা জয়নারায়ণ মৃতকল্প হইয়াছিলেন, এখন কোন প্রকারে জীবন বাঁচানই তাঁহার একান্ত

ইচ্ছা। শাসন কর্ত্তার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"জাহাঁপনার যাহা অভিপ্রায়, তাহার অন্যথা করে কাহার সাধ্য। আমার ঘরে টাকা থাকিলে এই যন্ত্রণা সহ্য করিব কেন? কোন প্রকারও দুই বৎসরের মধ্যে সমগ্র রাজস্ব আদায় করিতে পারি, এমত সম্ভব নাই। হুজুরের জমিদারী আপনার নিবার ইচ্ছা হইলে, আমি এই দণ্ডে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

সুবেদার বলিলেন,—"বক্‌সি! জয়নারায়ণ তাঁহার জমিদারী ইস্তাফা দিতে স্বীকৃত আছেন অতএব ইঁহার নিকটে রীতিমত ইস্তাফা গ্রহণ করিয়া মুক্তি প্রদান কর।"

জয়নারায়ণ প্রাণ ভয়ে ইস্তাফা লিখিয়া দিয়া অব্যাহতি প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু তৎকালে ইস্তাফা পত্র, একা জমিদার কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইলে তাহা শুদ্ধ হইত না; দেওয়ানের দস্তখৎ আবশ্যক হইত। সুতরাং রাজস্বসচিব নবাবের নিকট সে বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। কৃষ্ণরাম সেন তখন দেওয়ান, সুতরাং তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য পরওয়ানা বাহির হইল।

এদিকে রাজা জয়নারায়ণ কারামুক্ত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই বলিলেন! আজ রাজ রাজেশ্বর পথের ভিখারী হইলেন! কৃষ্ণরাম রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং তাঁহার এ প্রকার কার্য্যের জন্য তাঁহাকে কথঞ্চিৎ ভর্ৎসনাও করিলেন।*

---

* কৃষ্ণরাম সেন যখন প্রথম দেওয়ানী কার্যো নিযুক্ত হ'ন, তখন রাজা জয়নারায়ণ অত্যন্ত বালক ছিলেন। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া, কৃষ্ণরামের উপদেশানুসারে যাবতীয় কার্য্যই নির্ব্বাহ করিতেন এবং তাঁহাকে যথোচিত সম্মানও করিতেন।

রাজা বলিলেন,—"যাহা হইবার তাহা তো হইয়াছে; এখন আপনার দস্তখৎ হইলেই, ইস্তাফা পত্র শুদ্ধ হইতে পারে।"

কৃষ্ণরাম বলিলেন—"মহারাজ! আপনার অন্নে শরীর ধারণ করিয়াছি, আপনি আপনার নিজের দ্রব্য যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু আমার সে প্রকার ব্যবহারে অধিকার কি? আপনি ইস্তাফা দিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আমি প্রাণ থাকিতে কখনই সেই ইস্তাফা পত্রে স্বাক্ষর করিতে পারিব না।"

রাজা বলিলেন,—"আপনি ইস্তাফা পত্রে স্বাক্ষর না করিলে, প্রাণ-দণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে।"

কৃষ্ণরাম ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! প্রাণ অতি তুচ্ছ, প্রভুর কার্য্যোদ্ধারের জন্য অনেক দিন হইল ইহা উৎসর্গ করিয়াছি, আপনার কার্য্যোদ্ধারের জন্য যদি এই নশ্বর জীবন পাত হয়, তথাপি আমি সুখে মরিতে পারিব। যাঁহার অন্নে শরীর ধারণ করিয়াছি, যাঁহার অনুগ্রহে আমি এখন লোক সমাজে মান্য, আজ কোন প্রাণে সেই প্রাণ রক্ষকের যথাসর্ব্বস্ব নাশ করিব? প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার কিন্তু মহারাজ! আমার দ্বারা কিছুতেই ইস্তাফাপত্র স্বাক্ষরিত হইবে না।

অল্প দিন পরেই রাজানুচরগণ আসিয়া কৃষ্ণরামকে ধৃত করতঃ ঢাকায় লইয়া গেল। যথা সময়ে কৃষ্ণরাম রাজ প্রতিনিধি সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান রহিলেন।

নিবাইস মহম্মদ বলিলেন,—"দেওয়ান! তোমার প্রভু জয়নারায়ণ বাকী রাজস্ব দায়ে জমিদারী ইস্তাফা দিয়াছে, এখন তোমার স্বাক্ষর আবশ্যক, অতএব তুমি সেই ইস্তাফা পত্রে স্বাক্ষর করতঃ প্রস্থান করিতে পার।"

কৃষ্ণরাম শাসন কর্ত্তার বাক্য শ্রবণ করিয়া কোন উত্তর করিলেন না; নিস্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

দেওয়ানকে নিস্তব্ধ দেখিয়া পুনরায় সুবেদার বলিলেন,—"দেওয়ান! তুমি কি আমার কথা শুনিতে পাইতেছ না?"

কৃষ্ণরাম সেলাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"জাহাঁপানা! এ দাসকে অভয় প্রদান করিলে কয়েকটি কথা রাজসমীপে নিবেদন করিত।" শাসনকর্ত্তা ইঙ্গিতে অনুমতি প্রদান করিলে, কৃষ্ণরাম বলিলেন,—"হুজুর! আমার প্রভু রাজা জয়নারায়ণ সেলিমাবাদ পরগণার একমাত্র প্রধান ভূম্যধিকারী; তিনি এবং তাঁহার স্বর্গগত পূর্ব্বপুরুষগণ রাজভক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে হুজুরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছেন। চিরকাল নিয়মিত সময়ে তাঁহাদের রাজস্ব রাজকোষে দাখিল করিয়াছেন। কতিপয় বৎসর যাবত মহারাষ্ট্র দস্যুগণের উৎপীড়নে তাঁহার জমিদারীর অধিক স্থল একেবারে ধ্বংসাবশেষ হইয়াছে। অনেক গৃহস্থ প্রাণভয়ে বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে পলায়ন করিয়াছে। এই সমস্ত কারণে রাজস্ব বাকী পড়িয়াছে। জাহাঁপানা! অনুগ্রহপূর্ব্বক অন্ততঃ দুই বৎসরের জন্য অবকাশ প্রদান করিলে সমস্ত রাজস্ব আদায় হইত। যাঁহার বাহুবলে কত কত রাজ্য ধ্বংশ হইতেছে, যাঁহার সামান্য ভ্রুভঙ্গে রাজেন্দ্রগণ সিংহাসন চ্যুত হইতেছেন, তাঁহার ন্যায় মহাপ্রবল প্রতাপান্বিত নৃপতি একজন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর সামান্য ভূমি লইলে, রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি কিছুই হইবে না। জাহাঁপানা! অনুগ্রহপূর্ব্বক রাজা জয়নারায়ণের ক্ষুদ্র সম্পত্তি প্রত্যার্পণ করিবার অনুমতি প্রদান করুন।" কৃষ্ণরাম এই কথা বলিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

জনৈক অমাত্য বলিলেন,—"দেওয়ান মহাশয়! আপনি যাহা

বলিলেন সমস্তই স্বীকার্য্য, কিন্তু মহারাষ্ট্রদের উৎপীড়ন বঙ্গ, বেহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি সকল স্থানেই হইয়াছে, কিন্তু কোন ভূম্যাধিকারীর ত রাজস্ব তজ্জন্য বাকী পড়ে নাই। কেবল আপনার প্রভুই বোধ হয় অহঙ্কার বশতঃ রাজস্ব দাখিল করেন নাই। আরও বিশেষ আপনার প্রভু খাজানা দিতে অশক্ত বিধায়, স্বীয় জমিদারী ইস্তাফা প্রদান করিয়াছেন, এখন আপনার স্বাক্ষর হইলেই সেই ইস্তাফা পত্র শুদ্ধ হইতে পারে, অতএব আপনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া সত্বর স্বাক্ষর করুন।”

কৃষ্ণরাম বলিলেন “সাহেব! আপনি যাহা বলিলেন, সমস্তই বুঝিলাম। রাজা জয়নারায়ণ যে অহঙ্কার বশতঃ রাজস্ব দাখিল করেন নাই তাহা আপনি বুঝিতে পারিলে একথা বলিতেন না। থাক্, সে সব কথায় কোন প্রয়োজন নাই। রাজা জয়নারায়ণ তাঁহার জমিদারী ইস্তাফা দিয়াছেন, আমি তাঁহার কর্ম্মচারী, তাঁহারই অন্নে শরীর পোষণ করিতেছি, আমি কোন্ প্রাণে তাঁহার সর্ব্বনাশের হেতু হইব? আমা হইতে এই কাজ কিছুতেই সাধিত হইবে না।”

কৃষ্ণরামের বাক্য সমাপ্ত হইলে পর নিবাইস মহম্মদ বলিলেন “দেওয়ান! রাজার রাজস্ব বাকী পড়িলে, জমিদারী রক্ষা হয় না। তোমার প্রভু রাজস্ব দিতে অশক্ত হইয়া জমিদারী ত্যাগ করিয়াছেন। যাহার সম্পত্তি, সে যখন ত্যাগ করিল, তখন তোমার এই প্রকার আপত্তি বৃথা। অতএব অনুজ্ঞা করিতেছি যে এই মুহূর্ত্তে ইস্তাফা পত্র স্বাক্ষর কর।”

কৃষ্ণরাম করযোড়ে বলিলেন,—“জাঁহাপনা! আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে আছে যে, যিনি বিপদের সময় আশ্রয় দিয়া জীবন রক্ষা করেন,

সর্ব্বস্ব দিয়াও তাঁহার উপকার করিবে। রাজা জয়নারায়ণ আমার প্রভু, তাঁহার অন্ন আমার প্রত্যেক ধমনীতে বর্ত্তমান আছে। আমি স্বহস্তে কখনই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে পারিব না।”

কৃষ্ণরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিবাইস্ মহম্মদ কুপিত হইয়া বলিলেন “দেখ দেওয়ান! আমি এতক্ষণ তোমার মঙ্গলের জন্য এত কথা বলিয়াছি। তুমি আমার অনুজ্ঞানুযায়ী কার্য্য না করিলে তোমার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব যাহা বলিতেছি, তাহা এই মুহূর্ত্তে সম্পাদন কর, নচেৎ বলপূর্ব্বক কার্য্যোদ্ধার করিব।

কৃষ্ণরাম যোড়হস্তে ঈষৎ-হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন, “জাঁহাপানা! হিন্দু সন্তান কর্ত্তব্য কার্য্য, এবং প্রভুর রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। আপনি বলপূর্ব্বক আমার প্রাণ নাশ করিতে পারেন সত্য; কিন্তু আমার ইচ্ছা না হইলে কখনই, ইস্তাফা পত্রে স্বাক্ষর করাইতে পারিবেন না। বলপূর্ব্বক সেই কার্য্য করাইবার পূর্ব্বে আমি আত্মঘাতী হইব।”

কৃষ্ণরামের এই নির্ভীক উত্তর শ্রবণ করিয়া সভাসদ সকলেই চমকিত হইলেন। সুবেদার ক্রোধে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন; তন্মুহূর্ত্তে প্রহরিগণকে বলিলেন “ইহাকে অন্ধকার কারাগারে লইয়া যাও; যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা দ্বারা ইস্তাফা পত্রে দস্তখত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অত্যন্ত যাতনা দিবে।”

রক্ষিবর্গ তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণরামকে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে লইয়া গেল। শুনিয়াছি যে কারাগারে তিনি সাতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণরাম প্রহারে জর্জ্জরীভূত হইয়া অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়াছিলেন। গ্রীষ্মকালের দারুণ তাপে মধ্যাহ্ন সময়ে তাঁহার

হস্তপদ বন্ধন পূর্ব্বক তপ্ত বালুকাময় ভূমির উপর শোয়াইয়া রাখিত। তপ্ত লৌহ দ্বারা শরীরের স্থানে স্থানে পোড়াইয়া দিত। বিষ্ঠা মূত্র পরিপূর্ণ কূপের মধ্যে তাঁহাকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া রাখিত, ২।৩ দিন অন্তর যৎসামান্য আহার ও পানীয় জল প্রদান করিত। কিন্তু কৃষ্ণরাম তাহা মুসলমান প্রদত্ত বলিয়া স্পর্শ করিতেন না। যখন তিনি রাজাজ্ঞায় ধৃত হইয়া ঢাকায় নীত হইয়াছিলেন, সেই সময় কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন; তন্মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ * কারাধ্যক্ষকে কিছু কিছু উৎকোচ দিয়া, কৃষ্ণরামকে যৎসামান্য আহার্য্য প্রদান করিতেন।

এত যাতনা সহ্য করিয়াও মহাপুরুষ বিচলিত হইলেন না। প্রভুর সর্ব্বস্ব রক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এই প্রকার কতিপয় মাস গত হইল। এদিকে কৃষ্ণরাম, সঙ্গে করিয়া যে অর্থ আনিয়াছিলেন; তাহা প্রহরী প্রভৃতি এবং কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ প্রদান করিতে নিঃশেষ হইয়া গেল। এদিকে প্রহরিগণ অর্থ লোভে কৃষ্ণরামকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎপীড়ন করিতে লাগিল। কারাধ্যক্ষও টাকা না পাইয়া কৃষ্ণরামের আহার্য্য সামগ্রী প্রদানের অনুমতি করেন না। কৃষ্ণরামের সঙ্গীয় সেই বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে কারাধ্যক্ষকে অনুনয় বিনয় করিয়া মধ্যে মধ্যে আহার্য্য দ্রব্য প্রদান করিতেন। এদিকে কৃষ্ণরামের কারাবাস বৃত্তান্ত অন্য এক অনুচর দ্বারা অনতিবিলম্বে রায়েরকাঠি, রাজসদনে প্রচারিত হইল। রাজা জয়নারায়ণ এবং অন্যান্য সকলে

* শুনিয়াছি এই মহাত্মার নাম ৺ রামগোবিন্দ ন্যায়পঞ্চানন; ইনি পশ্চিমে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের আদিপুরুষ। তাঁহাকে কৃষ্ণরাম ৬০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও তাহা ভোগ করিতেছেন।

এই প্রকার অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সত্বরই প্রহরিগণ ও কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ প্রদানার্থ কতিপয় সহস্র মুদ্রা প্রেরিত হইল।

একদা মধ্যাহ্ন সময় কৃষ্ণরাম,হস্তপদাবদ্ধ অবস্থায় সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত বালুকা-শয্যায় পতিত আছেন, অনতিদূরে প্রহরী শীতল পাদপচ্ছায়ায় তৃণ-শয্যোপরি সুখে নাসিকাধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময় একজন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণরামকে তদবস্থায় পতিত দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে, এবং কেনই বা এই অবস্থায় এস্থানে পতিত রহিয়াছেন?"

কৃষ্ণরাম তখন অর্দ্ধচৈতনাযুক্ত; ক্ষীণ স্বরে বলিলেন "ঠাকুর! আমার পরিচয়ে আপনার কি আবশ্যক? আপনি এই দারুণ রৌদ্রে একাকী কি জন্য এস্থানে আগমন করিয়াছেন?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন "মহাশয়! আমি যারপরনাই বিপদগ্রস্ত; শুনিয়াছি, কীর্ত্তিপাশা নিবাসী রায়েরকাঠির দেওয়ান কৃষ্ণরাম সেন বড় দাতা, আমি তাঁহারই নিকট আগমন করিয়াছি।"

কৃষ্ণরাম তখন আত্মপরিচয় গোপন করিয়া বলিলেন "কৃষ্ণরাম সেন রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে অশেষ লাঞ্ছনায় কালাতিপাত করিতেছেন। তাঁহার নিকট আপনার কি প্রয়োজন?"

ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণরামের কারাবাসের বিষয় অবগত ছিলেন না, অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "হায়! আমাদের ন্যায় পাপাত্মা থাকিতে অমন পুণ্যবান ব্যক্তি রাজরোষে পতিত হইয়া কত কষ্ট সহ্য করিতেছেন!"

ব্রাহ্মণ এই প্রকার আক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় কৃষ্ণরাম

আবার বলিলেন "ঠাকুর! সকলই নিজ কর্ম্মফল-ভোগ, তজ্জন্য আক্ষেপ করা বৃথা। নিশ্চয়ই কৃষ্ণরাম কোন গুরুতর পাপে পাপী, নচেৎ তাঁহার অদৃষ্টে এমন দারুণ কষ্ট ভোগ কেন হইবে? থাক্ সে সব কথা, এখন তাঁহার নিকট আপনার কি প্রয়োজন, বলুন!"

এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় কৃষ্ণরামের সেই বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ, খাদ্য দ্রব্য ও রাজপ্রেরিত মুদ্রাসহ তথায় আগমন করিলেন। কৃষ্ণরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া আগন্তুক ব্রাহ্মণ বলিলেন "আপনার নিকট আমার দুঃখকাহিনী বলিলে কি ফল হইবে।"

কৃষ্ণরাম বলিলেন "অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতেও সময়ে সময়ে উপকার সাধিত হইয়া থাকে; আমার দ্বারা আপনার কোন উপকার হইলেও আমি সাধ্যানুসারে তাহা করিতে প্রস্তুত হইব।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন "মহাশয়! আমার তিনটী কন্যা বয়স্থা হইয়াছে, এবং একটী পুত্রেরও যজ্ঞোপবীত ধারণের বয়স প্রায় গত হইল। আমার এমন কোন সম্পত্তি নাই, যে আমি কোন প্রকারে মেয়ে তিনটীর কুলক্রিয়া এবং পুত্রের উপনয়ন বিধি সম্পন্ন করিতে পারি। শুনিয়াছিলাম যে কৃষ্ণরাম সেন অত্যন্ত দাতা তাঁহার নিকট আমার দুঃখকাহিনী বলিলে, আমার কষ্ট দূর হইবে। তাই এতদূর পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছি। আমার অদৃষ্ট দোষে তিনি কারারুদ্ধ।"

পরদুঃখ-কাতর কৃষ্ণরামের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি ভগ্ন-কণ্ঠে বলিলেন "ঠাকুর! কত টাকা হইলে আপনার এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"কন্যা তিনটীর কুলক্রিয়া, এবং পুত্রের যথাশাস্ত্র যজ্ঞোপবীত দিতে অন্যূন সহস্রাধিক মুদ্রার আবশ্যক।"

কৃষ্ণরামের হৃদয় বিগলিত হইল। তাঁহার সঙ্গীয় সেই বিশ্বস্ত

ব্রাহ্মণকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ব্রাহ্মণ আসিলে কৃষ্ণরাম বলিলেন "রাজবাড়ী হইতে আমার জন্য কত মুদ্রা আসিয়াছে।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন "বোধ হয় দুই সহস্র মুদ্রার কম নহে।"

কৃষ্ণরাম বলিলেন "আমি ঐ সমস্ত মুদ্রা এই ব্রাহ্মণের সাহায্যার্থ প্রদান করিলাম।" পরে সেই ব্রাহ্মণের দিকে নেত্রপাত করিয়া বলিলেন "ঠাকুর! আপনি যাহার নিকট আগমন করিয়াছেন, আমিই সেই হতভাগা কৃষ্ণরাম সেন। রাজ-রোষে পতিত হইয়া এই দারুণ লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি। আমার যে অবস্থা তাহা মহাশয় সাক্ষাৎ দেখিতেছেন; তাই আশানুরূপ দান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিলাম না। ঐ যে নিকটে তোড়া বান্ধা টাকা রহিয়াছে, তাহা সমস্তই আমার। আমি ঐ সমস্ত মুদ্রা আপনাকে প্রদান করিলাম; আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন অতি শীঘ্র আমার এই পাপ দেহ পাত হয়।

ব্রাহ্মণ এতক্ষণ কৃষ্ণরামের পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলেন না; এখন জানিতে পারিয়া অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এই প্রকার অবস্থায় এতাদৃশী দানশক্তি দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত হইলেন। কৃষ্ণরামের সঙ্গীয় ব্রাহ্মণও অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

আগন্তুক ব্রাহ্মণ কোন বাক্যব্যয় করিতেছেন না দেখিয়া কৃষ্ণরাম কহিলেন "ঠাকুর! বোধ হয় আপনার আশানুরূপ দান হয় নাই বলিয়া মৎপ্রদত্ত এই ক্ষুদ্র দান গ্রহণ করিতেছেন না। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করিলে আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।"

কৃষ্ণরামের সঙ্গীয় ব্রাহ্মণও এই প্রকার অলৌকিক মহানুভাবতা দর্শন করিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন; কিয়ৎকাল বিলম্বে বলিলেন "রাজা জয়নারায়ণ আপনার এই প্রকার দুর্দ্দশা নিবারণ করিবার

জন্য প্রহরী প্রভৃতিকে উৎকোচাদি প্রদান করিতে এই মুদ্রা পাঠাইয়াছেন, আপনি অবলীলাক্রমে জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত দান করিলেন। এখনই প্রহরিগণ তাহাদের নিকট প্রতিশ্রুত অর্থ না পাইলে আপনাকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতে পারে, অতএব এখন কি প্রকারে আপনার জীবন রক্ষা হইবে ভাবিয়া পাই না।”

বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণের নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু পতন হইতে লাগিল। আসন্ন মৃত্যুশয্যায় শায়িত কৃষ্ণরামের মুখকান্তি প্রফুল্ল হইল। তিনি বলিলেন “যখন জন্মধারণ করিয়াছি, তখন অবশ্যই একদিন মৃত্যু হইবে। পরোপকার ব্যতীত মানবজীবনের আর কি অধিক ধর্ম্ম হইতে পারে? আমার মরণ নিশ্চয়, তবে এই আসন্ন মৃত্যু সময় এই ব্রাহ্মণের কথঞ্চিৎ উপকার হইল দেখিয়া আমি সুখে মরিতে পারিব।”

এই মহৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণদ্বয় অতীব পুলকিত হইলেন, তাঁহাদের বাক্য কথনের শক্তি যেন রুদ্ধপ্রায় হইল। কৃষ্ণরাম আগন্তুক ব্রাহ্মণকে মুদ্রা গ্রহণ জন্য পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

এই প্রকার কথোপকথনে নিকটস্থ নিদ্রিত প্রহরী জাগরিত হইয়া সমস্ত ঘটনা শ্রবণপূর্ব্বক অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এই প্রকার অলৌকিক দান সে চক্ষে দেখা দূরে থাকুক, কর্ণেও শ্রবণ করে নাই। এইরূপ ক্রমে ক্রমে তথায় অনেক প্রহরী এবং অন্যান্য লোক সমাগত হইল। সকলেই এই অদ্ভুত দান শ্রবণ করিয়া একবাক্যে এই লোকাতীত কর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিল। ক্রমে এই কথা প্রচার হইয়া প্রথমতঃ কারাধ্যক্ষ, তৎপর রাজসভার অন্যান্য ওমরাহগণ, সর্ব্বশেষে স্বয়ং শাসনকর্ত্তা শ্রবণ করিলেন। এই প্রকার লোক বিস্ময়কর অদ্ভুত

দানের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক তিনি অতিশয় পুলকিত হইয়া, কৃষ্ণরামকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অচিরে কৃষ্ণরামকে বন্ধনমুক্ত করিয়া নিকটে আনিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

কয়েক মাস যাবত কঠোর কারাবাসে এবং নৃশংস প্রহারে কৃষ্ণরামের শরীর এতদূর জীর্ণ এবং বিবর্ণ হইয়াছিল যে নিরাইস মহম্মদ প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। এই প্রকার ধার্ম্মিক মহাপুরুষের এতাদৃশ কষ্ট দর্শন করিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। ত্বরায় তাঁহার শুশ্রূষার জন্য কতিপয় হিন্দু পরিচারক নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

যথাসময়ে কৃষ্ণরাম সুস্থ হইলেন। অনন্তর শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেওয়ান! লোকমুখে তোমার যে অসাধারণ দানশক্তি এবং প্রভুভক্তির কথা শুনিয়াছি, তাহা কি সকলি সত্য?" কৃষ্ণরাম কোন বাক্য প্রয়োগ করিলেন না, মৌনাবলম্বনে রহিলেন।

সভাস্থ যাবতীয় লোক এবং অন্যান্য অমাত্যগণ সকলেই এই অদ্ভুত পুণ্যময়ী কথা শুনিয়াছিলেন। কৃষ্ণরামকে নিস্তব্ধ দেখিয়া সভাসদ্‌গণ হইতে একজন প্রৌঢ় রাজকর্ম্মচারী করযোড়ে বলিলেন "জাঁহাপানা! আপনি যাহা যাহা শুনিয়াছেন, তাহার এক কথাও মিথ্যা নহে। এতাদৃশ প্রভুভক্ত, এবং পরদুঃখকাতর মহাপুরুষ কখনও দর্শন করি নাই। এই পাপ পূর্ণা স্বার্থময়ী পৃথিবীতে যে এতাদৃশ আত্মোৎসর্গের জীবন্ত দৃষ্টান্ত আছে, তাহা কখনও দর্শন করা দূরে থাকুক, কর্ণেও শ্রবণ করি নাই। হুজুর! এই মহাত্মা নিজের শরীর পাত করিয়া প্রভুকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, বোধ হয় আর কয়েক দিবস কারাগারে থাকিলে, ইহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইত। সঙ্গীয় একজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ, কারাধ্যক্ষ, এবং প্রহরিগণকে কিছু কিছু উৎকোচ প্রদান করিয়া, সামান্য আহার্য্য সামগ্রী যোগাইত; ক্রমে

সঞ্চিত অর্থ ধ্বংস হইলে, কারাধ্যক্ষ আহার্য্য সামগ্রী বন্ধ করিবার উপক্রম করাতে, প্রভু জয়নারায়ণ, কতিপয় সহস্র মুদ্রা, ইঁহার সাহায্যার্থে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই দিন যখন প্রহরিগণ, তাঁহাকে প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় হস্ত পদাদি বন্ধন পূর্ব্বক তপ্ত বালুকা শয্যায় রাখিয়াছিল, তখন জনৈক দীন ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থী হইয়া ইঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ ইঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। অনেক পীড়াপীড়ির পর ব্রাহ্মণ তাঁহার আগমনের কারণ ব্যক্ত করিলে, পরদুঃখ কাতর মহাপুরুষ স্বীয় জীবনকে তুচ্ছ করিয়া সমস্ত অর্থ তাঁহাকে দান করিয়াছেন। জাঁহাপনা! এই প্রকার লোকাতীত দান, আত্মোৎসর্গ, অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব। এই প্রকার মহাপুরুষ দর্শনে আমাদের পূর্ব্বকৃত সমুদয় পাপ ক্ষয় হইল। জানিতাম না যে এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে এমন পুণ্যবান মহাপুরুষ বাস করিতেছেন।”

রাজকর্ম্মচারী নিস্তব্ধ হইলে, সভাসদ্‌গণ সকলেই একবাক্যে কৃষ্ণরামকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শাসনকর্ত্তা তখন কৃষ্ণরামের সঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, এবং সেই ভিক্ষার্থী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই যথাযথ ব্যক্ত করিলে, প্রহরির নিকটও সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইল; সেও প্রকৃত উত্তর প্রদান করিল।

অত্যন্ত হর্ষাগমে নিবাইস মহম্মদের শরীর কণ্টকিত হইল। তিনি আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, কৃষ্ণরামকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন “দেওয়ান! আজ যাহা শুনিলাম এরূপ লোকাতীত অদ্ভুত পুণ্য কার্য্য আর কখনও শ্রবণ করি নাই। তুমি ধন্য, এবং তোমার ন্যায় একজন সুকৃতী পুরুষ আমার রাজত্ব মধ্যে বাস করিতেছে, এই জন্য

আমিও আজ নিজকে ধন্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা কর, বল, আমি তাহা পূর্ণ করিয়া তোমার সৎ-কার্য্যের কতক পুরস্কার করি।"

কৃষ্ণরাম, শাসনকর্ত্তাকে ভূমি পর্য্যন্ত শির নত করিয়া সেলাম করিলেন; তৎপর যুক্ত করে নিবেদন করিলেন, "জাঁহাপনা! দেবতা ব্রাহ্মণ, গো, এবং প্রভু সেবা হিন্দুসন্তানগণের কর্ত্তব্য কার্য্য, আমি যৎকিঞ্চিৎ সেই কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি; তজ্জন্য আমি প্রশংসার যোগ্য নহি। আপনি নিজ দয়াগুণে যখন আমাকে পুরস্কৃত করিতে চাহিতেছেন, তখন আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রভু রাজা জয়নারায়ণকে তাঁহার পরিত্যক্ত রাজত্ব পুনঃ প্রদানের অনুমতি করেন তাহা হইলেই আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হইয়াছি মনে করিব।" এই বলিয়া কৃষ্ণরাম কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন।

শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন— "দেওয়ান! তুমি ধন্য! এতাদৃশী প্রভুভক্তি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আমি সরল চিত্তে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করণার্থ জয়নারায়ণের যে রাজস্ব বাকী পড়িয়াছে, তৎসহ তাঁহার পরিত্যক্ত জমিদারী তাঁহাকে পুনরায় প্রদান করিবার জন্য নবাব সমীপে জ্ঞাপন করিব। তোমার সৎকার্য্যের পুরস্কার অবশ্যই প্রদত্ত হইবে। দেওয়ান! তুমি নিজে কি কোন প্রকার পুরস্কৃত হইতে ইচ্ছা কর না?"

কৃষ্ণরাম বলিলেন "প্রভুর রক্ষাই আমার নিজের পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার; তাঁহার রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিলে, আমি আমার সন্তান সন্ততিগণসহ তাঁহারই অন্নে জীবন ধারণ করিতে পারিব। জাঁহা-পনা! আমি দরিদ্র, আমার অধিক ধনে কোন প্রয়োজন নাই। আপনি আজ স্বীয় অসীম দয়াগুণে আমাকে যে পুরস্কার প্রদান

করিলেন, তজ্জন্য রাজা জয়নারায়ণ এবং আমি আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিব। পরম মঙ্গলময় জগদীশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করি যে তিনি নিয়ত আপনার মঙ্গল বিধান পূর্ব্বক আপনার রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন।"

এই প্রকার উত্তরে সুবেদার অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এ দিকে নবাব বাহাদুরের অনুমতি পত্র পহুঁছিলে, নিবাইস মহম্মদ ত্বরায় রাজা জয়-নারায়ণের রাজত্ব পুনঃ প্রদানের পরওয়ানা সহ কৃষ্ণরামকে কতক ধন দিয়া বিদায় দিলেন।

এদিকে কৃষ্ণরাম নবাবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া যথা সময়ে রায়েরকাঠি আগমন পূর্ব্বক রাজার নিকট সমস্ত ঘটনা বলি-লেন। এই অসম্ভাবিত লোকবিস্ময়কর অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করিয়া জয়নারায়ণ এবং অন্যান্য সকলে চমৎকৃত হইলেন। রাজা জয়নারায়ণ কৃষ্ণরামকে পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহাকে অশেষ প্রকার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে নবাব প্রদত্ত পরওয়ানা এবং ধন রাজার সম্মুখে রক্ষা করিয়া কৃষ্ণরাম বলিলেন,"মহারাজ! আপনার ধর্ম্মবলে আপনার রাজ্য পুনরুদ্ধার হইয়াছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করুন।"

রাজা জয়নারায়ণ বলিলেন—"দেওয়ান! আমার এই রাজ্য আমি স্বয়ং ইচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, ইহার আবার পুনরুদ্ধার হইবেক, এরূপ আশা ছিল না। আপনি ইহার উদ্ধার কর্ত্তা, সুতরাং এই রাজত্বে আমার কোন স্বত্ব নাই। আপনি উদ্ধার করিয়াছেন, আপনিই গ্রহণ করুন।

রাজার এই প্রকার মহতী উক্তি শ্রবণ করিয়া সভাসদ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কৃষ্ণরাম বলিলেন "মহারাজ! আপনি আমার

প্রভু, আপনারই অন্নে আমার শরীর, আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য পালন করিয়া রাজ্য উদ্ধার করিয়াছি, সুতরাং ইহাতে আমার কোন স্বত্ব নাই; আপনার রাজত্ব আপনিই গ্রহণ করুন। আপনি এই প্রকার করিলে আমার অন্তঃকরণে বড়ই কষ্ট উপস্থিত হইবে।

রাজা জয়নারায়ণ বলিলেন—"দেওয়ান! আমি তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে আমি যখন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আমার সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন ইহাতে আমার কোন স্বত্ব নাই; আপনি স্বীয় অসাধারণ ধর্ম্মবলে ইহা উদ্ধার করিয়াছেন, সুতরাং আপনিই ইহার যোগ্য।"

কৃষ্ণরাম রাজাকে রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রাজাও কোন ক্রমে রাজ্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। অনেক ক্ষণ পরে কৃষ্ণরাম গলদশ্রুলোচনে বলিলেন—"মহারাজ! আপনার রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলাম। এই শরীরে যে কত প্রহার, কত কষ্ট, কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা কেবল অম্লান বদনে আপনার রাজ্য রক্ষার্থ স্বীকার করিয়াছিলাম। নবাবের কৃপায় এবং দৈবানুগ্রহে তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি যখন ইহা গ্রহণ করিলেন না, তখন আমার প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।" এই বলিয়া কৃষ্ণরাম অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই প্রকার অনেক কথোপকথনের পর রাজা জয়নারায়ণ বলিলেন—"আপনি যদি আমার একটা অনুরোধ পালনে প্রতিশ্রুত হন তাহা হইলে আমি আপনার প্রস্তাবিত বিষয় সম্মত হইতে পারি।

কৃষ্ণরামের মুখকান্তি মেঘ নির্ম্মুক্ত শশধরবৎ প্রফুল্ল হইল। তিনি বলিলেন—"মহারাজ! আপনি আমার প্রভু, সুতরাং আপনার আজ্ঞা

আমার সকল সময়েই শিরোধার্য্য, যাহা অনুমতি করেন, সাধ্য হইলে অবশ্যই তাহা প্রতিপালন করিব।"

জয়নারায়ণ বলিলেন—"আপনি যদি এই রাজত্বের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করেন, তবে আমি রাজ্য গ্রহণে স্বীকৃত আছি।"

কৃষ্ণরাম্ বলিলেন—"মহারাজ! অপনি এ কি কথা বলিতেছেন, আমি চাকর হইয়া কি প্রকার আপনার সহিত তুল্য হইব! প্রাণ থাকিতে তাহা পারিবনা।

রাজা যখন দেখিলেন যে কৃষ্ণরাম কিছুতেই জমিদারীর তুল্য অংশ গ্রহণ করিতেছেন না, তখন চারি আনি, তিন আনি, দুই আনি পর্য্যন্ত অংশ গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণরাম তাহাতেও স্বীকৃত হইলেন না দেখিয়া রাজা বলিলেন, আপনি আজ আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ আপনাকে পুরস্কৃত না করিলে আমার গুরুতর অধর্ম্ম হইবে।

কৃষ্ণরাম বলিলেন—"যদি আমাকে পুরস্কার দান করাই আপনার অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে আপনার জমিদারীর মধ্যে আমাকে কতক ভূমি দান করুন, যাহা দ্বারা আমার সন্তান সন্ততি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।"

রাজা জয়নারায়ণ বড়ই পুলকিত হইলেন। কৃষ্ণরামের প্রার্থনানুযায়ী, তৎপুত্র রাজারাম সেন নামে এক বৃহৎ তালুক অর্পণ করিলেন। এই সময় হইতেই আমাদের পূর্ব্ব সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল। আমাদের যত ভূ-সম্পত্তি আছে, তন্মধ্যে এই তালুক সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ শেষে স্ব স্ব বুদ্ধিবলে অন্যান্য বিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই তালুক সৃষ্টির পূর্ব্বে রাজা জয়নারায়ণের অনুমতি ক্রমে কৃষ্ণ-

রাম সেন ভ্রাতৃগণ সহিত, ৺ রঘুদেব রায়ের তালুক স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺ কাশীরাম সেন ও পুত্র রাজারাম সেন নামে ক্রয় করিয়াছিলেন। এই তালুকের অংশ কাশীরাম তিনআনি, কৃষ্ণরাম ও রাজারামের নামাকরণে ছয় আনি, বিষ্ণুরাম তিনআনি, এবং বলরাম চারিআনি প্রাপ্ত হইলেন। কাশীরাম, কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম এবং বলরামের বংশধরগণ অদ্যাপি সেই তালুক ভোগ করিতেছেন। কৃষ্ণরামের বংশধরগণ ব্যতীত অনেকের অংশ নীলাম, এবং কবলা দ্বারা আমাদের নিকট বিক্রীত হইয়াছে।

কৃষ্ণরাম সেনের অপর ভ্রাতৃবর্গের বংশধরগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া কৃষ্ণরামের বংশধর মহাপুরুষগণের পরিচয় প্রদান করিব।

(৺ কাশীরাম সেন)

সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ কাশীরাম সেনের এক পুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম হরেকৃষ্ণ সেন। ইঁহার জীবনের কোন ঘটনাই পাওয়া যায় নাই। শুনিয়াছি ইনি পৈতৃক তালুকের আয় দ্বারা সুখ সচ্ছন্দে কালাতীপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামকিশোর পিতার ন্যায় পিতামহের তালুক দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তৎপুত্র কৃষ্ণমোহন সেন অতিশয় বিচক্ষণ এবং কর্ম্মঠ লোক ছিলেন। তিনি নিজ বুদ্ধিবলে পৈতৃক তালুক হইতে অনেক বিত্ত সৃজন করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি যে ইনি অতিশয় সাহসী এবং বলবান পুরুষ ছিলেন; নিজ বাহুবলে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্জীব ভূম্যধিকারিগণের বিত্ত জোর পূর্ব্বক দখল করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম কাশীচন্দ্র; ইনিও পিতার ন্যায় অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। ধর্ম্মকার্য্যে ইঁহার বিশেষ প্রবৃত্তি ছিল।

ইনি, তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে এক পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এক প্রশস্ত জলাশয় খনন পূর্ব্বক তাহার চতুষ্পার্শে মহা সমারোহ পূর্ব্বক এক "মেলা" মিলাইয়াছিলেন। কাশীচন্দ্র দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে কালীপ্রসন্ন সেন নামক এক পুত্র জন্মিয়াছিল; দ্বিতীয়া স্ত্রী নিঃসন্তান। কালীপ্রসন্ন সেনও পিতার ন্যায় বুদ্ধিমান এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ; ইনিও ব্রাহ্মণকে দান, বিপন্নের বিপদুদ্ধার করিয়া লোকসমাজে যশস্বী হইয়াছিলেন। ইঁহারই সময় ইঁহার পৈতৃক তালুক নীলামে বিক্রীত হয়। শুনিয়াছি ইঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করার মূল ইঁহার পরম বিশ্বস্ত একজন কর্ম্মচারী। কালীপ্রসন্ন ইঁহাকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করিয়া, ইহার উপর সমস্ত কার্য্য কর্ম্মের ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। দুর্ব্বৃত্ত বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা প্রভুর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। এই কর্ম্মচারীর চক্রান্তে কালীপ্রসন্নের কতিপয় তালুকের প্রজাগণ "জোট" হইয়া খাজনা বন্ধ করিয়াছিল। সমস্ত প্রজা শাসনে কালীপ্রসন্নের প্রভূত ঋণ হইয়াছিল। এজন্য তাঁহার সম্পত্তি নীলামে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময় ইহার অবস্থা অতি শোচনীয়। কয়েক বৎসর অতীত হইল তাঁহার একমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র সারদাপ্রসন্ন তাঁহারই সমক্ষে চিতারোহণ করিয়াছেন। সারদাপ্রসন্নের মৃত্যুর অনেক বৎসর পূর্ব্বে কালীপ্রসন্নের একমাত্র কন্যার মৃত্যু হইয়াছিল। সারদাপ্রসন্নের একমাত্র বালিকা কন্যাই এখন হতভাগ্য কালীপ্রসন্নের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল।

(৮ বিষ্ণুরাম সেন)

তৃতীয় ভ্রাতা বিষ্ণুরাম অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। শুনিয়াছি ইনি রায়েরকাঠির অধীনস্থ সুতালরি নামক

স্থানে তহশীলদারী কার্য্য করিতেন। কৃষ্ণরামের পুত্রকে সাড়ে সাত বুড়ি (১৫০টী) সোণার নথ প্রথম যৌতুক দিয়াছিলেন। শুনিয়াছি ভ্রাতষ্পুত্রের জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মফঃস্বল হইতে বাড়ী আসিবার সময় পথের স্ত্রীলোকগণের নাক হইতে সেই সমস্ত 'নথ' ছিড়িয়া আনিয়া, ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখ দেখিয়াছিলেন।* বিষ্ণুরাম নিজের সম্পত্তি অনেক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম রামেশ্বর; ইনিও রায়েরকাঠির অধীনে চাকরী করিতেন। তাঁহার দেবীচরণ নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। দেবীচরণের তিন পুত্র; সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ মদনমোহন, মধ্যম কালাচাঁদ এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ রামগতি। ভ্রাতৃত্রয় প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে সকলেই পৃথগান্ন হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা চাকরী করিতেন, আর কেহ কেহ বা পৈতৃক বিষয়াদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। জ্যেষ্ঠ মদনমোহনের চারি পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে ৺ চন্দ্রকান্ত সেন সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, আনন্দচন্দ্র মধ্যম, উমানাথ তৃতীয় এবং দুর্গানাথ সেন সর্ব্বকনিষ্ঠ। ইঁহাদের মধ্যে তৃতীয় এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা এখনও জীবিত আছেন। ৺ চন্দ্রকান্ত সেন মহাশয়ের অতি শৈশবাবস্থায় মৃত্যু হইয়াছিল। ৺ আনন্দনাথ সেন মহাশয়কেও আমি দেখিয়াছি। ইঁহার মৃত্যু অতি শোচনীয়, গত ১২৯৩ সালে ১৮ই কার্ত্তিক তারিখে মধ্যাহ্ণ সময় স্নান করিতে ঘাটে গিয়াছিলেন; জলের মধ্যে স্নান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ এক কৃষ্ণ সর্প জলের মধ্যে থাকিয়াই তাঁহার বামপদের অঙ্গুষ্ঠোপরি দংশন করে। তীক্ষ্ণ বিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া অতি কষ্টে তীরে উঠিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্রই তাঁহার মৃত্যু হইল। আমরা সকলেই তখন আহার করিতেছিলাম, হঠাৎ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া

* শ্রীযুক্ত উমানাথ সেন মহাশয় নিজমুখে আমার নিকট বলিয়াছেন।

তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের বাড়ী গিয়া আর জীবিত দেখিতে পাইলাম না। ইনি সম্পর্কে আমার খুল্লপ্রপিতামহ হইতেন। ইঁহার বৈষয়িক বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। ইঁহার তিন কন্যা, কোন পুত্রসন্তান জীবিত নাই।

তৃতীয় উমানাথ সেন, অতি ধীর এবং সরল প্রকৃতির লোক। পৈতৃক তালুকের আয় ব্যতীত অন্য কোন প্রকার আয় নাই। অতি কষ্টে ইঁহার সংসার নির্ব্বাহ হইতেছে। ইঁহার পুত্রের নাম মহিমাচন্দ্র সেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ দুর্গানাথ সেনও বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং কর্ম্মঠ। ইনি পিরোজপুরে থাকিয়া মোক্তারি কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার ভ্রাতার অপেক্ষা তাঁহার সাংসারিক অবস্থা ভাল। তারকচন্দ্র এবং সখানাথ নামক তাঁহার দুই পুত্র ছিল; তন্মধ্যে সখানাথ পিতামাতা আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। ইঁহারা সকলে এখন পৃথগান্ন।

কালাচাঁদ সেন নিঃসন্তান। তৃতীয় ভ্রাতা রামগতির গুরুপ্রসাদ এবং মোহনচন্দ্র নামক দুই পুত্র ছিল। গুরুপ্রসাদের পুত্রের নাম কালীপ্রসন্ন। মোহনচন্দ্রের তিন পুত্র; কৈলাসচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র এবং মধুসূদন। ইঁহারা সকলেই একান্নবর্ত্তী। ইঁহারা সম্পর্কে আমার খুল্লপিতামহ।

(৮ বলরাম সেন)

বলরাম সেন স্বীয় বুদ্ধিবলে নিজ নামে আর এক বিত্ত সৃজন করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহে শ্যামরাম এবং সোণারাম নামক দুই পুত্র এবং অপর বিবাহে জয়চন্দ্র এবং গোপীচন্দ্র নামক দুই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃগণ কাল সহকারে সকলেই পৃথগান্ন হইলেন। জ্যেষ্ঠ শ্যামরামের পুত্রের নাম প্রাণ-

মাণিক্য। প্রাণমাণিক্যের পুত্রের নাম শম্ভুচন্দ্র। আমি ইঁহাকে দেখিয়াছি। প্রায় অশীতি বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। ইনি বুদ্ধিমান কার্য্যতৎপর এবং আমোদপ্রিয় ছিলেন। ইনি সম্পর্কে আমার খুল্লপ্রপিতামহ। ইঁহার পুত্র নবীনচন্দ্র এখনও জীবিত আছেন। ইনি আমাদের ষ্টেটে তহশীলদারী কার্য্য করিতেন। নবীনচন্দ্রের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠের নাম চিন্তাহরণ।

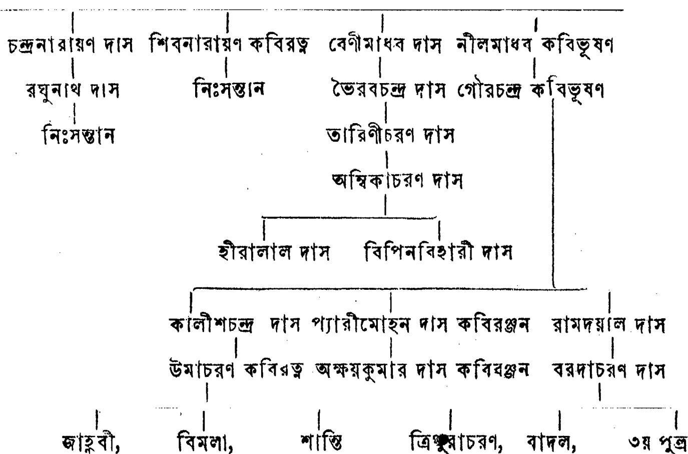
সোণারাম সেনের কোন সন্তানাদি নাই। জয়চন্দ্রের দুই পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠ গোলকচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ মোহনচন্দ্র। গোলকচন্দ্রের পুত্র অখিলচন্দ্র এখনও জীবিত আছেন। নানাপ্রকার সাংসারিক দায়াবদ্ধ হেতু তাঁহার পৈতৃক তালুকের অধিকাংশ আমাদের নিকট বিক্রীত হইয়াছে। এখন অতি কষ্টে তাঁহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। তাঁহার একপুত্র, নাম বসন্তকুমার। অখিলচন্দ্র সম্পর্কে আমার খুল্লপ্রপিতামহ।

মোহনচন্দ্রের কোন সন্তানাদি নাই। গোপীচন্দ্রের পুত্র গৌরচন্দ্র নিঃসন্তান।

রাজা জয়নারায়ণের কৃপায় কৃষ্ণরামের দিনদিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বহুকাল রাজ সরকারে কার্য্য করিয়া কৃষ্ণরাম স্বীয় পুত্রকে নিজ কার্য্যভার প্রদান করতঃ অবসর গ্রহণ করিলেন। গৃহে বসিয়া জপ, তপ, পূজা প্রভৃতি সৎকার্য্যে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অনেক সৎ ব্রাহ্মণকে বহু পরিমাণে ব্রহ্মোত্তর দান করিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও কৃষ্ণরামের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর নিরাপদে ভোগ করিতেছেন। কৃষ্ণরামের একপুত্র এবং এক কন্যা জন্মিয়াছিল পুত্র রাজারাম এবং কন্যার নাম জয়মালা। যশোহর জেলার অন্তর্গত

কালিয়া নিবাসী ৺ রামরাম দাস ঘটক বিশারদের * সহিত জয়মালার ববাহ দিয়া তাঁহাকে এই গ্রামে স্থাপিত করিয়াছিলেন। ধন্বন্তরিকল্প স্বনাম খ্যাত পুণ্যবান পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ৺ প্যারীমোহন দাস কবিরঞ্জন, জয়মালার বংশধর। অদ্যাপি ইঁহারা কৃষ্ণরামের প্রদত্ত বিশাল জায়গীর ভোগ করিতেছেন।

রাজারাম সেন ও কাশীরাম সেন তালুকের সৃষ্টি অবধি আমরা "মজুমদার" নামে অভিহিত। অদ্যাপি সকলে আমাদের বাড়ী "মজুমদার বাড়ী" বলিয়া থাকেন। আজ কাল বৃটিশগবর্ণমেণ্টের কৃপায় যদিও অনেকে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া "রায় বাহাদুর" "রাজা" "খাঁ বাহাদুর' প্রভৃতি উপাধি নিজের জীবন কাল পর্য্যন্ত ভোগ করিবার জন্য ক্রয় করিয়া শ্লাঘার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা আবাহমান কাল পর্য্যন্ত "মজুমদার" উপাধিতে অত্যন্ত



সুখানুভব করিয়া থাকি। রায়েরকাঠি হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কৃষ্ণরাম স্বগৃহে ভগবতী সিদ্ধেশ্বরীর পাষাণময়ী দশভূজা মূর্ত্তি এবং সর্ব্বকল্যাণ দায়িনী মাতা মনসার ঘট স্থাপনা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক দিন স্বয়ং দেবী গৃহে উপস্থিত থাকিয়া স্বরচিত অর্ঘ্য এবং পূজোপকরণে ষোড়শোপচারে দেবী পূজা করাইতেন। তাঁহার কৃত নিয়মানুসারে অদ্য পর্য্যন্ত ও সেই প্রকার দেবী পূজা হইয়া থাকে। এই দেবীমূর্ত্তি দ্বয় ব্যতীত তিনি একটী শিবলিঙ্গ এবং গোপাল মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কোন প্রকার ব্যারামে কৃষ্ণরামের মৃত্যু হয় নাই শুনিয়াছি। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে নিকটে আহ্বান করিয়াছিলেন, ১১৬৬ সালে ৭১ বৎসর বয়সে ইনি স্বজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণরামের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, তিনি ন্যায়পরায়ণতা, পরদুঃখ কাতরতা, ধর্ম্মচিন্তা, পরোপকার সাধন, জিতেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। উচ্চ পদস্থ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইতে অতি নীচ ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলের সহিত সমভাবে আলাপ করিতেন। তাঁহার সদা সহাস্য বদনে কখনও কোন প্রকার বিষাদ রেখা অঙ্কিত হয় নাই। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে তিনি ভীত না হইয়া হাস্যবদনে বলিতেন। "যিনি বিপদে ফেলিয়াছেন, তিনিই উদ্ধার করিবেন।" বাস্তবিক এতাদৃশী দৃঢ় ঈশ্বরভক্তির নিমিত্তই তাঁহার জীবনে কোন প্রকার অমঙ্গল সাধিত হয় নাই। কৃষ্ণরামের ন্যায় এতাদৃশ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন মহাপুরুষ তৎকালে সেলিমাবাদে দ্বিতীয় কেহ ছিলেন কি না বহু অনুসন্ধানেও জানিতে পারা যায় নাই।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজারাম।

এই স্বনাম খ্যাত পরম পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ ১১২৪ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রদেশে অদ্য পর্য্যন্ত ও এই মহাপুরুষের নাম এতদূর বিখ্যাত এবং লোকের এমন বিশ্বাস যে "রাজারামের দোহাই দিলে বৃষ্টি হয় না।" কেহ কোন সৎকার্য্যের আয়োজন করিয়া বিস্তর নিমন্ত্রিত লোকদিগকে আহার করাইতে বসাইয়া দিয়াছে হয়ত সেই সময় বৃষ্টির আবির্ভাব হইবার উপক্রম হইল, অমনি রাজারামের "দোহাই" দিতে আরম্ভ; দৃঢ় বিশ্বাস যে বৃষ্টি হইয়া তাহার সমস্ত আয়োজন নষ্ট হইবে না। কোন বৃক্ষে ফল ধরিতেছে না, গৃহস্বামী মানস করিলেন যে, এই গাছে যদি ফল হয়, তবে তাহার প্রথম ফলটী রাজারামের নামে উৎসর্গ করিব। অদ্যাপিও এমত ঘটনা অহরহঃ হইতেছে। আমার জীবনে আমি এরূপ উৎসর্গীকৃত ফল অনেক ভক্ষণ করিয়াছি। বড় অধিক দিনের কথা নয়, কোন স্নেহপাত্র, গুরুজনকে নমস্কার করিলে, "রাজারামের ন্যায় পুণ্যবান হও" এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিতেন।

তিন চারি বৎসর অতীত হইল আমি একদা বাড়ী হইতে কলিকাতা রওনা হইয়াছি। কাউখালী ষ্টেশন হইতে যখন ষ্টীমারে উঠিলাম, তখন ষ্টীমারের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাকে দেখিতে পাইলেন। ষ্টীমারে উঠিলে কিছুকাল পরে এই ভদ্রলোক আমার নিকটে আসিয়া আমার নাম, পিতার নাম, বাড়ী ইত্যাদির সমস্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের নাম তাঁহার শ্রুত ছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। আমি কিন্তু তাঁহার এই প্রকার আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম। আমি সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীকে, সেই দিন ভিন্ন ইহার পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। আমি বিরক্ত হইয়াছি দেখিয়া তিনি বলিলেন "আমার এই ব্যবহারে আপনি বিরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু আপনি যে বংশের সন্তান, তাহাতে আপনার সহিত আলিঙ্গন করিলে শরীর পবিত্র হয়, আপনি স্বর্গীয় দেব কল্প রাজারামের সন্তান, সুতরাং অবশ্য তাঁহার কৃত পুণ্য আপনাতে বর্ত্তমান আছে। আপনার সহিত আলিঙ্গন করিয়া আমার পাপদূর হইল। আমি বড়ই লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিলাম।

এই ধর্ম্মময় মহাপুরুষের সম্যক্ জীবনী পাওয়া যায় না। এতদ্দেশে এখনও তাঁহার নামে অনেকগুলি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। আমি আমার স্বর্গীয়া জননীর মুখে এই মহাপুরুষের সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিয়াছি। তন্মধ্যে একটী গল্প উল্লেখ করিব।

আমাদের কুলপুরোহিত ৺ গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রায় অশীতি বৎসর বয়সে গত ফাল্গুন মাসে মৃত্যু হইয়াছে। তিনিও এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে তাঁহার অলৌকিক দানের একটী গল্প করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিব।

রায়েরকাঠির কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, কৃষ্ণরাম তাঁহার পদে পুত্র রাজারামকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজারাম পিতা হইতে বুদ্ধিতে, বিদ্যায় এবং ধর্ম্মে ন্যূন ছিলেন না। তিনিও পিতার ন্যায় কায়মনোবাক্যে রায়েরকাঠির রাজত্বের উন্নতি বিধান করিতে লাগিলেন। রাজা জয়নারায়ণ যদিও কৃষ্ণরামকে হারাইয়াছিলেন, তথাপি রাজারাম দ্বারা তাঁহার সে অভাব পূরণ হইয়াছিল। রাজা-রামকে তিনি ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন এবং রাজারামও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠের ন্যায় ভক্তি করিতেন। রাজা জয়নারায়ণের অনুগ্রহে এবং রাজারামের অসাধারণ বুদ্ধিবলে তিনি নিজে অনেক বিত্ত এবং নগদ সম্পত্তি করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি যে, রাজারামের বুদ্ধিবলে রায়েরকাঠির অনেক অপহৃত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার হইয়া-ছিল। তাঁহার সুবন্দোবস্তে প্রজাবর্গ অতিশয় সুখে ছিল। চোর প্রভৃতির অত্যাচার তিরোহিত হইয়া সমস্ত জমিদারীতে শান্তি বিরাজ করিতেছিল।

এই সময় রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুর অব্য-বহিত পূর্ব্বে রাজা জয়নারায়ণ তাঁহার পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "পুত্রগণ! কৃষ্ণরাম সেন হইতেই আমার এই রাজত্ব রক্ষা। আমার পূর্ব্বেই তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তৎপুত্র রাজারাম পিতৃগুণে বিভূষিত হইয়া পিতার ন্যায় কায়মনোবাক্যে আমার রাজত্বের উন্নতি সাধন করিতেছেন। আমি লোকান্তরিত হইলে এই পরম বিশ্বস্ত হিতৈষী বান্ধবকে কখনও কোন দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ অথবা পরিত্যাগ করিবে না।" পুত্রগণ স্বীকৃত হইলেন।

রাজার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজপুত্রগণের আত্মকলহ উপস্থিত হইল। সকলেই স্বীয় প্রভুত্ব রক্ষা করিয়া সর্ব্বময় কর্ত্তা হইতে চাহি-

লেন। ঘোরতর অরাজকতায় রাজত্ব টল মল করিতে লাগিল। রাজারাম কোন পক্ষই অবলম্বন করিলেন না। তিনি সকলকেই বুঝাইয়া, জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের উপর শাসন ভার অর্পণ পূর্ব্বক রাজ্য রক্ষার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল না। সকলেই রাজারামকে চাহেন। রাজারাম যে পক্ষাশ্রিত হইবেন, সেই পক্ষেরই জয়লাভ হইবে, সুতরাং সমস্ত রাজপুত্রগণ রাজারামকে নানাবিধ প্রলোভন, কেহ কেহবা অপমান ইত্যাদির ভয় দেখাইতেও লাগিলেন। রাজারাম কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। ধীর গম্ভীর-ভাবে সমস্ত রাজপুত্রগণকে ভবিষ্যতের উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার উপদেশবাণী বৃথা হইল। রাজপুত্রগণ সকলেই রাজা-রামের সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

রাজারাম ঘোরবিপদে পতিত হইলেন, সকল রাজপুত্রগণই রাজা জয়নারায়ণের সন্তান, তিনি এক পক্ষ অবলম্বন করিলে, অন্যের অনিষ্ট হইবে, সুতরাং এইরূপ মহাপাতকের কার্য্য তিনি কি প্রকারে করিবেন? বিশেষতঃ তাঁহার স্বর্গীয় জনক এই রাজত্ব হইতেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; আজ ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া কি প্রকারে তিনি এইরূপ সর্ব্বনাশের কার্য্যে লিপ্ত হইবেন।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর রাজারাম বলিলেন "রাজপুত্রগণ! বুঝি-য়াছি যে আপনাদের অমঙ্গলের ষোলকলা পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমার বেশ বিশ্বাস হইতেছে যে প্রকার গৃহবিবাদে আপনারা সকলে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আপনাদের রাজত্ব অচিরাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

আপনাদের অন্নেই আমার শরীর এবং সকলেই আমার নিকট তুল্য, আমি কি প্রকারে একজনের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক অন্যের ক্ষতি

করিব! আমা হইতে এই প্রকার গুরুতর অধর্ম্মের কার্য্য কিছুতেই সাধিত হইবে না। আপনাদের স্বর্গ-গত পিতৃদেবের কৃপায় আমার যে কিছু সামান্য সম্পত্তি আছে, তাহাতেই আমার এবং আমার পরিবার বর্গের ভরণপোষণ অনায়াসে নির্ব্বাহ হইবে। আমার সমক্ষে যে আপনাদের সর্ব্বনাশ হইবে এবং আমি স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিব তাহা কখনই হইবে না, আপনারা আমাকে বিদায় প্রদান করুন, মঙ্গল কামনা করিতে করিতে চলিয়া যাই।” রাজারামের নয়নদ্বয় ছল ছল করিতে লাগিল।

রাজারামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজপুত্রগণ সকলেই ভাবিলেন যে, রাজারাম যখন কোন পক্ষই অবলম্বন করিলেন না, তখন তাঁহার স্থানান্তর গমন করাই শ্রেয়ঃ। রাজপুত্রগণ সম্মতি প্রদান করিলে, অশ্রুপূর্ণলোচনে রাজারাম রায়েরকাঠি হইতে বিদায় হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যেন রায়েরকাঠির রাজলক্ষ্মীও অন্তর্হিতা হইলেন।

রায়েরকাঠি হইতে বিদায় হইয়া রাজারাম স্বভবনে বাস করিয়া নিজের বৈষয়িক উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। রাজবংশের পরস্পরের বিবাদের কথা শুনিয়া তিনি যারপরনাই মর্ম্মাহত হইতেন।

এদিকে রাজারাম কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আসিলে রাজপরিবার মধ্যে প্রত্যেকের বিদ্বেষানল এতদূর প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল যে, একে অন্যের হৃদয়ের শোণিত দ্বারা ঈর্ষ্যানল নির্ব্বাপিত করিবার জন্য লালায়িত হইলেন। রাজারাম আর থাকিতে পারিলেন না। স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া রায়েরকাঠি গমন করিলেন। অনেক পরিশ্রম করিয়াও উদ্ধত স্বভাব রাজপুত্রগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে পারিলেন না।

রাজা জয়নারায়ণের জীবিত থাকা সময় কোন এক প্রধান

রাজকর্ম্মচারী অতিশয় ধর্ম্ম বিগর্হিত এক মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। অচিরে সেই কথা রাজসমীপে প্রচারিত হইলে, রাজা জয়নারায়ণ অভিযোগকারী এবং অভিযোক্তাকে সম্মুখে আনয়ন পূর্ব্বক সবিশেষ তদন্ত করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রধান রাজপুরুষ উৎকোচাদি দ্বারা অন্যান্য সকলকে এইরূপ ভাবে বশীভূত করিয়াছিলেন, যে রাজা জয়নারায়ণ কোন প্রকারে অভিযোগকারীর কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পর রাজা অভিযোগকারীকে মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে কারাগারে প্রেরণের আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

রাজারাম সমস্তই জানিয়াছিলেন, তিনি এতক্ষণ কোন কথাই না বলিয়া কি প্রকার ঘটনা দাঁড়ায় তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। যখন দেখিলেন যে একজন নিরপরাধ ব্যক্তি অবিচারে কারাগারে প্রেরিত হইতেছে, তখন তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সমস্ত ঘটনা রাজসমীপে নিবেদন করিলেন।

রাজারামের বাক্য শ্রবণ করিয়া অপরাধীর মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। রাজাও দেওয়ানের কথায় অনেকটা বিশ্বাস করিলেন। গোপনে অনুসন্ধান পূর্ব্বক প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া রাজা জয়নারায়ণ অপরাধীকে অতিশয় কঠোর শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাহার যথা স্বর্ব্বস্ব রাজসরকারে আনিলেন।

নিদারুণ মনঃপীড়ায় অপরাধী, রাজকর্ম্মচারী রাজারামের প্রতি প্রতিহিংসা লইবার উপযুক্ত অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদা নিশিথ সময় রাজারাম তাঁহার শয়নগৃহে নিদ্রিত আছেন, এমত সময় সেই রাজপুরুষ তীক্ষ্ণধার তরবারি হস্তে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য সেই গৃহে প্রবেশ করিল। অকস্মাৎ রাজারামের নিদ্রা

ভঙ্গ হইলে, শয্যাপার্শ্বে কৃপাণধারী পুরুষকে দেখিতে পাইয়া তিনি ভীত হইলেন। হত্যাকারী রাজারামকে জাগ্রত দেখিয়া "তোর কথায় আমার সর্ব্বনাশ হইল, দেখি এখন কে তোরে রক্ষা করে।" এই বলিয়া দুরাত্মা তীক্ষ্ণধার তরবারী শূন্যে উত্তোলন করিল।

মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া রাজারাম স্থির মনে মুদ্রিত নয়নে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্রীর চরণ-যুগল মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এই প্রকার অনেকক্ষণ গত হইল। হত্যাকারীর তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাঁহার হৃৎপিণ্ড ভেদ হইল না।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইল। সূর্য্যোদয় হইল, তথাপি রাজারামের শয়নকক্ষের দ্বার-রুদ্ধ দেখিয়া কতিপয় ব্যক্তি দ্বার ভগ্নপূর্ব্বক সেই গৃহে প্রবেশ করতঃ এক অদ্ভুত দৃশ্য অবলোকন করিল। রাজারাম শয্যার উপর পদ্মাসনে মুদ্রিত লোচনে উপবেশন করিয়া স্থির ভাবে রহিয়াছেন। পার্শ্বদেশে উত্তোলিত কৃপাণ হস্তে সেই রাজপুরুষ নিশ্চল জড়পদার্থের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

প্রবেশকারিগণ সেই কৃপাণধারী পুরুষকে বাঁধিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে সে ঠিক এক ভাবেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার চক্ষের পলক পড়িতেছে না,—হস্ত, পদ যে অবস্থায় ছিল, ঠিক সেই ভাবেই রহিয়াছে, জীবনের চিহ্নস্বরূপ নাসিকা দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছিল। অনুচরগণ তাহাকে বন্ধন করিবার সময় সে একটী বাক্যও উচ্চারণ করিল না।

এ দিকে অতি কষ্টে রাজারামের চৈতন্য সম্পাদন হইলে তিনি নয়নোন্মীলন করিবামাত্রই সেই হত্যাকারীর দেহে যেন চৈতন্যের উদয় হইল। সে মহাভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিল।

এই আশ্চর্য্য ঘটনা প্রচারিত হইবামাত্র রাজানুচরগণ সেই হত্যা-কারীকে সহ রাজারামকে রাজসদনে লইয়া গেল।

রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতীব বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজারামের পুণ্যবলে যে স্বয়ং জগন্মাতা তাঁহাকে আকস্মিক মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এ কথা সকলেই বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

হত্যাকারী রাজার নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়া বলিল "আমি যখন রাজারামকে কাটিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিয়াছিলাম তখন আমার বোধ হইল যেন জগন্মাতা দশভূজা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া রাজারামকে ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার ত্রিনয়ন হইতে যেন ধক ধক অগ্নি শিখা বহির্গত হইয়া আমাকে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে। অত্যন্ত ভয়ে আমি হতচেতনাবস্থায় দণ্ডায়মান ছিলাম। তারপর যাহা যাহা হইয়াছে, তাহা সমস্তই আপনি অবগত হইয়াছেন।"

এই প্রকার অভূতপূর্ব্ব ঘটনা অবগত হইয়া রাজা জয়নারায়ণ এবং অন্যান্য সকলে রাজারামকে অতিশয় সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে অপরাধীর প্রতি উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিবার জন্য রাজা জয়নারায়ণ তাহাকে কাজির নিকট প্রেরণ করিলেন।

কাজি সাহেব সমস্ত জানিয়া পরিশেষে হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। ইহা শুনিয়া রাজারাম অতিশয় ব্যথিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কাজীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে বলিলেন "কাজি সাহেব! অবধান করুন; আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের জন্য আপনি আজ একটা মহাপ্রাণ নাশ করিতে অনুমতি প্রদান

করিয়া আমাকে ঘোর নরকে নিমগ্ন করিতেছেন। যাহাদের প্রাণ দানের ক্ষমতা নাই, তাহাদের প্রাণনাশের কি অধিকার? হুজুর! আপনি ধর্ম্মাবতার, আমার জন্য ইহার প্রাণ বধ করিয়া অধর্ম্মের কার্য্যে লিপ্ত হইবেন না। আমি পূর্ণহৃদয়ে ইঁহাকে ক্ষমা করিতেছি, আপনি ইহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া অক্ষয় ধর্ম্ম উপার্জ্জন করুন।

এই প্রকার মহতী উক্তি শ্রবণ করিয়া কাজী সাহেব এবং অন্যান্য সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অবিলম্বে তাহাকে মুক্তিপ্রদান করিলেন। *

রায়েরকাঠি হইতে প্রত্যাগত হইয়া, রাজারাম স্বীয় বৈষয়িক কার্য্য করিতেন। অকৃত্রিম ধর্ম্মবলে এবং অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলে তিনি প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পুণ্যাহ তিথিতে সূর্য্যোদয়ের অতি পূর্ব্বে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নান আহ্নিক সমাপনান্তে শুচি হইয়া ব্রাহ্মণকে দান করিতেন। এই সিলেমাবাদ পরগণাস্থ অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তান এখনও রাজারামের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমি নিরাপদে ভোগ করিতেছেন।

একদা এই প্রকার কোন এক পুণ্যাহ দিনে রাজারাম স্নানান্তে শুচি হইয়া দান করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যষ্টি হস্তে তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। রাজারাম ব্রাহ্মণকে স্বাগত দেখিয়া, আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন এবং সমাদর পূর্ব্বক অন্য আসনে উপবেশন করাইয়া তাঁহার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন "শুনিয়াছি যে আপনি নাকি প্রত্যেক পুণ্যাহ দিনে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দান করিয়া থাকেন।

* এই প্রকার অনেকগুলি কথা আমি আমার স্বর্গীয়া জননী দেবীর নিকট শুনিয়াছি। রাজকর্ম্মচারী যে কি গুরুতর ধর্ম্মবিগর্হিত পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহা জানিতে পারি নাই।

আমি অতিশয় দীন ব্রাহ্মণ, বহুদূর হইতে আপনার সুনাম শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিয়াছি।’,

ব্রাহ্মণের বাক্য সমাপ্ত হইলে রাজারাম যুক্তকরে বলিলেন “হে ব্রাহ্মণ! দান করিবার আমার কি সাধ্য আছে, তবে পুণ্যাহ দিনে ব্রাহ্মণ সন্তানকে কিঞ্চিৎ প্রদান করিবার মানস করিয়াছি; আপনি কি প্রার্থনা করেন, অনুমতি করুন, আপনার প্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হইব।”

ব্রাহ্মণ বলিলেন, শুনিয়াছি যে “আপনার স্বর্গীয় জনক স্বীয় জীবনের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। আপনিও সেই পুণ্যবান পিতার উপযুক্ত পুত্র হইয়াছেন। আশীর্ব্বাদ করি যে, দিন দিন আপনার শ্রীবৃদ্ধি হউক। আমি যাহা প্রার্থনা করি, আপনি তাহা পূর্ণ করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলে তাহা ব্যক্ত করিতাম।”

রাজারাম ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ কৌতূহলী হইলেন। কিয়ৎকাল বিলম্বে বলিলেন “ঠাকুর! আমার এমন কি সৌভাগ্য যে দেবতা ব্রাহ্মণকে আশানুরূপ দান করিয়া কৃতার্থ হইব। আপনি স্বচ্ছন্দচিত্তে আপনার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন। সাধ্যাতীত না হইলে অবশ্যই তাহা প্রদান করিয়া ধন্য হইব।”

ব্রাহ্মণ বলিলেন “তবে আপনি আমার নিকট আমার বাঞ্ছিত ধন দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।”

রাজারাম বলিলেন “আমিত বলিয়াছি যে আমার সাধ্যাতীত না হইলে আপনার প্রার্থিত বিষয় তৎক্ষণাৎ দান করিব। এখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার প্রার্থিত বিষয় জানাইলে বাধিত হইব।”

ব্রাহ্মণ বলিলেন "আপনার স্বকৃত এবং পিতৃকৃত স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্তিলাভ করুন।"

ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া রাজারামের সদা সহাস্য আনন আরও প্রফুল্ল হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন "ঠাকুর! আমার এমন কি সৌভাগ্য উপস্থিত হইল যে, আমার এই অকিঞ্চিৎকর ধন সম্পত্তি ব্রাহ্মণকে দান করিতে পারিব? এই পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, আপনি যদি এই তুচ্ছ সম্পত্তি প্রার্থনা না করিয়া আমার জীবন পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিতেন, আমি অকাতরে, ব্রাহ্মণপদে স্বীয় জীবন ত্যাগ করিতাম।"

এই বলিয়া রাজারাম তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাম্র পাত্রে গঙ্গোদক তিল এবং তুলসী আনয়ন পূর্ব্বক সংযত চিত্তে, ব্রাহ্মণকে যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে উদ্যত হইলেন। রাজারামকে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যথাবিহিত দান করিতে উদ্যত দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন "মজুমদার! ক্ষান্ত হউন। আমি আপনার সর্ব্বস্ব দান গ্রহণ করিতে আসি নাই। আমি আপনার বিপ্রভক্তি এবং দানশক্তির পরীক্ষা লইতে আসিয়াছিলাম। দেশান্তরে আপনার যে প্রকার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়াছি, আজ স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিলাম। পুরাণে শুনিয়াছি যে রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনিকে সমগ্র সাম্রাজ্য দান করিয়াছিলেন। আর আজ স্বচক্ষে সেই প্রকার আর একটী উদাহরণ দর্শন করিলাম। মজুমদার! তুমি ধন্য, তুমি তোমার স্বর্গীয় জনকাপেক্ষাও পুণ্যবান। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, এত প্রভূত ধন সম্পত্তি লইয়া কি করিব, ইহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমার এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, আমি ইহার শাসন সমরক্ষণ করিতে পারিব। অচিরাৎ দস্যু এবং তস্কর কর্ত্তৃক ইহা গৃহীত

হইবে। তোমার হাতে এই সম্পত্তি দ্বারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র প্রতিপালিত হইতেছে। অতএব তোমার ইহা দান করা হইবে না। আমি প্রসন্নচিত্তে তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ-জনিত কোন প্রকার পাপে তোমাকে লিপ্ত করিতে পারিবে না। আমি দরিদ্র, তোমার এই বিপুল সম্পত্তি লইয়া আমার কোন প্রকার আবশ্যক নাই। আমার এবং আমার পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে এইরূপ পরিমাণ ভূমি পাইলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট।" এই বলিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজারামকে দানকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

রাজারাম করযোড়ে বলিলেন "দেব! আমার এই যৎসামান্য সম্পত্তি গ্রহণে আপনার যখন একবার অভিলাষ হইয়াছে, তখন আমি কোন ক্রমেই ব্রাহ্মণের অভিলষিত বিষয় ভোগ করিতে পারিব না। অতএব আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে আপনি আমাকে দানকার্য্য হইতে বিরত করিবেন না।"

ব্রাহ্মণ রাজারামের এই মহতী বাণী শ্রবণ করতঃ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, আমি সরল চিত্তে বলিতেছি যে আপনাকে পরীক্ষা করা ব্যতীত আমার মনে অন্য কোন প্রকার অভিপ্রায় ছিল না। ইহাতে আপনার কোন প্রকার অধর্ম্ম নাই। আমি সন্তুষ্টচিত্তে আপনাকে অনুমতি করিতেছি।*

এই লোকাতীত দানের প্রসঙ্গ অচিরাৎ দেশময় রাষ্ট্র হইল। সকলেই এই প্রকার অভূতপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের কথা শ্রবণ করিয়া পরম পুণ্যাত্মা রাজারামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

* আমাদের কুলপুরোহিত ৺ গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন যে এই ব্রাহ্মণ তাঁহাদের বংশের আদিপুরুষ।

এই প্রদেশে এখনও জনপ্রবাদ যে রাজারাম তাঁহার পিতৃ প্রতিষ্ঠিত ভগবতী সিদ্ধেশ্বরীকে স্তবে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক দিন প্রভাতের পূর্ব্বে স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক শুচি হইয়া দেবী-মন্দিরে গমন পূর্ব্বক একাকী যোগ সাধনা করিতেন। বোধ হয় এই জন্যই লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। আমার মা বলিয়াছেন যে, অনেকে নাকি রাজারামকে সেই দেবী মন্দিরের রুদ্ধকপাটে, কর্ণ রাখিয়া মৃদু কথোপকথনের শব্দ পাইয়াছিলেন। অন্যে যে যাহা বলুন, আমার জননীর এ সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। রাজারাম "সহস্রাবৃত্তিঃ" করিয়াছিলেন। প্রতিপদাদিকল্পারম্ভে, দক্ষিণা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত, দেবী সম্মুখে সঙ্কল্প করিয়া যে সহস্রবার চণ্ডী পাঠ হয়, তাহাকেই সহস্রা বৃত্তি কহে। সমস্ত পরগণার পণ্ডিতগণ নিরূপিত সময়ের মধ্যে আগমন পূর্ব্বক দেবী সম্মুখে, এই প্রকার চণ্ডী আবৃত্তি করিতেন। প্রত্যেক পণ্ডিত পাথেয় ব্যতীত নয় টাকা করিয়া বিদায় পাইতেন। এই প্রকার কার্য্য তৎকালে নাটোরের রাজবাড়ী ব্যতীত আর কোথাও হইত না।*

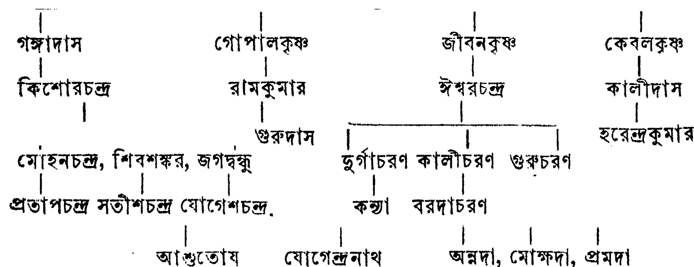
রাজারাম পিতার ন্যায় স্বহস্তে দেবী-পূজার আয়োজন করিতেন। দেবী-পূজা অন্তে দীন, দরিদ্র এবং অতিথিকে অন্নদান করিয়া সর্ব্বশেষে নিজে ভোজন করিতেন। ব্রাহ্মণ, অতিথি এবং বালককে তিনি দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাহারা তাঁহার নিকট

* "সহস্রা বর্ত্তনাল্লক্ষ্মী রাবৃণোতি স্বয়ং স্থিরা
ভুক্ত্বা মনোরথান্ কামান্ নরোমোক্ষ্যমবাপ্নুয়াৎ
যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট দেবানাঞ্চ যথা হরি
স্তবনামাপ সর্ব্বেশাং তথা সপ্ত সতীস্তব॥

দুর্গোৎসব-তত্ত্ব।

যখন যে প্রার্থনা করিত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিতেন। কোন অঙ্গহীন ব্যক্তি তাঁহার নিকট ভিক্ষার্থী হইয়া আগমন করিলে, তিনি তাহাদের আশাতীত অর্থ প্রদান করিতেন। কোন পঙ্গু আশ্রয়হীন হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশ্রয় দিয়া স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। অপরাহ্নে পণ্ডিতমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া, তন্ত্র, পুরাণ, বেদান্ত উপনিষদ্ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। বাসণ্ডা নিবাসী ৺ জয়দেব সেন মহলানবিস মহাশয়ের* কন্যা রামমালার সহিত রাজারামের শুভ-পরিণয় হইয়াছিল। গঙ্গাদাস প্রভৃতি কয়েক ভ্রাতা কিশোরচন্দ্র, শিবশঙ্কর প্রভৃতি আমাদের ষ্টেটে চাকরী করিতেন।

* জয়দেব মহলানবিস



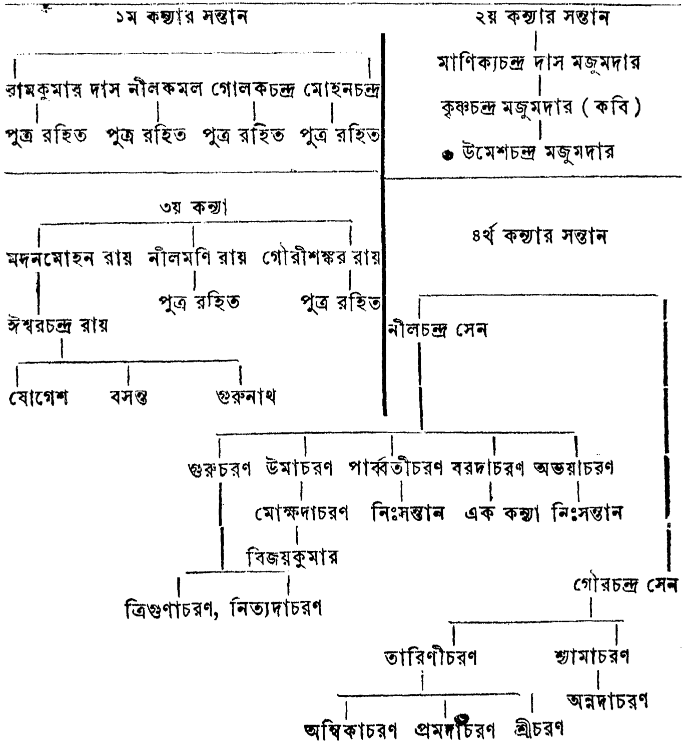
গঙ্গাদাস প্রভৃতি কয়েক ভ্রাতা, কিশোরচন্দ্র, শিবশঙ্কর প্রভৃতি আমাদের ষ্টেটে কার্য্য করিতেন।

রামমালা অতিশয় বুদ্ধিমতী এবং তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। ইঁহার গর্ব্ভে রাজারামের মহাবলবান তেজস্বী দুই পুত্র এবং চারি কন্যা* জন্মিয়াছিলেন।

পুত্রগণ মধ্যে নবকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ এবং কালাচাঁদ কনিষ্ঠ ছিলেন। স্বনাম প্রসিদ্ধ পুণ্যবান কবিশ্রেষ্ঠ সদ্ভাবশতক প্রণেতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ৺ রাজারামের দৌহিত্রের পুত্র।

---

* রাজারাম সেনের দৌহিত্র বংশ তালিকা।



১১৭৫ সালে ৫১ বৎসর বয়সে ৺ রাজারাম সেন স্বজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছিলেন। নাভিগঙ্গায় থাকিয়া অনেক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন। দুই তিনখান দানপত্র আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। রাজারামই প্রথম আমাদের ভদ্রাসনে ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

রাজারাম তাঁহার পিতার ন্যায় সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও উদারচেতা, পরদুঃখ কাতর, ধার্ম্মিক এবং সদ্ব্যয়ী ছিলেন। কৃষ্ণরামের ন্যায় রাজারামেরও অলৌকিক দানশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে কৃষ্ণরাম যে অবস্থায় দান করিয়াছিলেন এবং রাজারাম যে অবস্থায় দান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহার তুলনায়, কৃষ্ণরামের দান অধিক প্রশংসা যোগ্য। রাজারাম পিতা অপেক্ষাও খ্যাতি কেন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কোন কারণ জানিতে পারা যায় নাই।—তাঁহার নামেই তালুক সৃজিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ হইবার সম্ভব।





চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নবকৃষ্ণ ও কালাচাঁদ।

৺ রাজারাম সেন মহাশয়ের স্বর্গারোহণ সময়ে নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদ নাবালক ছিলেন। সুতরাং সম্পত্তি রক্ষার ভার রাজারামের স্ত্রী রামমালার উপর ন্যস্ত ছিল। এই রমণী অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না এবং অভিমানিনী ছিলেন। ইঁহার বৈষয়িক কার্য্যের সময় ভূসম্পত্তি এবং নগদ টাকার অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল। বৈষয়িক কার্য্যের ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত থাকিলেও ইনি অতিশয় দৃঢ়তা এবং প্রখর বুদ্ধির পরিচয় দিয়া সর্ব্বত্র যশস্বিনী হইয়াছিলেন।

কথিত আছে, ইঁহার বৈষয়িক কর্ত্তৃত্বের সময় ইঁহার সহোদরগণ আমাদের ষ্টেটে কোন কোন স্থানে তহসীলদারী কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে আদায়ী টাকা এবং হিসাব পত্র দাখিল না করিয়া মফঃস্বল হইতে বাসাওয় পলায়ন করিয়া আসেন। রামমালা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পুত্রদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের মাতুলালয় প্রেরণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"যদি তোমরা তোমাদের মামাদের নিকট হইতে টাকা এবং কাগজপত্র হস্তগত করিতে না পার, তাহা

হইলে আমি বুঝিব যে তোমরা প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া কিছুতেই সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবে না। এবং তোমাদিগকে অক্ষম দেখিলে তোমাদের মুখ দর্শন করিব না।

ভ্রাতৃদ্বয় তখনই মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক মাতুলালয় গমন করিলেন। নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদকে আগতপ্রায় দেখিয়া তাঁহাদের মাতুলগণ তৎক্ষণাৎ অন্যস্থানে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মাতুলানীগণ নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের বসিবার জন্য ঘরের বারিন্দায় একখান সামান্য চাটাই পাতিয়া উপবেশন করিতে দিলেন। নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদ মাতুলদের দীনভাব অবলোকনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া মাতুলগণের কথা জিজ্ঞাসা করায় মাতুলানীগণ বলিলেন যে, তাঁহারা নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদের আগমনে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদ মাতুলদিগকে আশ্বাস প্রদান করিলে তাঁহারা গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া স্বরূপ ঘটনা নিবেদন করিলেন।

নবকৃষ্ণ বলিলেন,—"যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে। কিন্তু আপনারা কাগজপত্র এবং টাকা না দিলে কিছুতেই আমাদের অব্যাহতি নাই। আমরা যখন বাড়ী হইতে রওনা হইয়া আসি, তখন মা বলিয়াছেন যে, যদি আমরা আপনাদের নিকট হইতে টাকা এবং কাগজপত্র লইয়া যাইতে না পারি, তাহা হইলে তিনি কিছুতেই আমাদের মুখ দর্শন করিবেন না। অতএব যে প্রকার হউক, আপনাদের কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাদের এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে।"

নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদ মাতাকে এরূপ ভয় করিতেন যে, বহুদিন পর্য্যন্ত মাতুলালয় বিলম্ব পূর্ব্বক সমস্ত টাকা এবং হিসাব সহ মাতৃ

চরণে প্রণাম করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, রামমালার জীবনকাল পর্য্যন্ত, আর কথনই তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ কোন প্রকার চাকরী প্রাপ্ত হন নাই।*

কীর্ত্তিপাশার সন্নিহিত বাউলকান্দা নামক গ্রামে বহুতর মুসলমানের বাস। বর্ত্তমান সময় এই সমস্ত মুসলমানগণের মধ্যে প্রায় সমস্তই আমাদের কার্য্য করিয়া থাকে। ৺ নবকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের সমকালীন বর্ত্তমান মুসলমানদিগের মধ্যে কোন একজনের পূর্ব্বপুরুষ অত্যন্ত উৎপীড়নকারী এবং দুর্দ্ধর্ষ ছিল। শুনিয়াছি তাহাদের একটী "লবণের জাল" ছিল। পথিক এবং বিদেশী লোকদিগকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদের ঐ "জালে" কার্য্য করিতে পাঠাইয়া দিত। একদা আমাদের থানাবাড়ীর কোন একজন কায়স্থ প্রজাকে জোর পূর্ব্বক এই সমস্ত মুসলমানগণ লবণের জালে পাঠাইয়া দেয়। তাঁহার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ কাঁদিয়া সমস্ত ঘটনা রামমালার নিকটে জ্ঞাপন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রোধান্বিতা হইয়া পুত্রদ্বয়কে নিকটে ডাকিলেন। এই ঘটনা যে সময় ঘটিয়াছিল তখন নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদ উভয়ই প্রাপ্তবয়স্ক। নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদ সেই সময় স্নান করিতে যাইতেছিলেন। মাতৃআজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি রোষ কষায়িত লোচনে বলিলেন,—"মলঙ্গিগণ† যখন জোর পূর্ব্বক আমার থানাবাড়ীর প্রজা ধরিয়া নিতেছে, তখন আর কয়েক দিন পরে তোদেরও স্ত্রী পুত্র সমেত লইয়া যাইবে।"

নবকৃষ্ণ ও কালাচাঁদ যুক্ত করে নিবেদন করিলেন। "আপনার কি আজ্ঞা।"

* আমাদের ষ্টেটের সদর থাজনার হিসাবের প্রধান কার্য্যকারক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র বক্‌সি মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি।

† সেই সমস্ত মুসলমানগণকে মলঙ্গি বলিত।

তিনি বলিলেন "আর অধিক কি বলিব, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই সমস্ত দুর্ব্বৃত্তদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়া না আসিবি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি জলগ্রহণ করিব না।"

ভ্রাতৃদ্বয় তৎক্ষণাৎ বহুলোক সমভিব্যহারে মুসলমানদের আবাসে উপস্থিত হইয়া সকলকে এরূপভাবে প্রহার করিয়াছিলেন যে, তন্মধ্যে অনেকেরই জীবন সংশয়াপন্ন হইয়াছিল। লবণের জাল লুটপাট করিয়া সমস্ত বন্দিদের মুক্তিপ্রদান পূর্ব্বক, থানা বাড়ীর সেই প্রজাকে সহ মাতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মুসলমানগণ সেই অবধি শান্ত প্রকৃতি ধারণ করিল। লবণের জালের চিহ্ন মাত্রও রহিল না।

রামমালা অনেকগুলি বৈষয়িক কার্য্যের শৃঙ্খলা করিয়া গিয়াছিলেন। মফঃস্বলে এরূপ ভাবে নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক স্থান হইতে সপ্তাহ অন্তর 'আহার্য্য' তরকারি, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি সাংসারিক নিত্যকার্য্যের জিনিস আসিত।

বৈষয়িক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যখন পরমার্থ চিন্তা করিতেন, তখন যদি কোথা হইতে খাজনার টাকা আসিত, তাহা হইলে নিজে তাহা অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিতেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "আমাদের টাকা আছে, আমরা বড়মানুষ হইয়াছি, এ কথা, আমার পুত্রবধূগণ জানিতে পারিলে অত্যন্ত অহঙ্কারিণী হইবে। সংসারে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা হইবার সম্ভব।

রামমালা অনেক দান, এবং অন্যান্য সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। একটী প্রশস্ত দীর্ঘিকা খনন করাইয়া, তাহার উৎসর্গ উপলক্ষে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি নবদ্বীপ পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া তথাকার পণ্ডিতমণ্ডলী এবং দেশ মধ্যস্থ ও বিক্রমপুর ঢাকা প্রভৃতির পণ্ডিতগণকে বহু অর্থদান করিয়াছিলেন। পুত্রবধূগণকে ক্ষণকালের

নিমিত্ত গৃহকার্য্য হইতে অবসর দিতেন না ;—স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের দ্বারা সংসারের যাবতীয় কার্য্য করাইতেন।

নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া বিষয়কার্য্য আরম্ভ করিলে পরও তিনি অনেককাল জীবিত ছিলেন।

সন ১১৬৪ সালে নবকৃষ্ণ মজুমদার মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কালাচাঁদ বোধ হয় জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা তিন চারি বৎসরের কনিষ্ঠ ছিলেন। দুই ভ্রাতার এতাদৃশ প্রণয় ছিল যে, চিরদিন একত্রে আহার, একত্র বেড়ান, একত্র আমোদ প্রমোদ করিতেন। একের কোন গতিকে বিদেশ গমন হইলে, অন্যে অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতেন। বিষয়কার্য্যের ভার যদিও নবকৃষ্ণের উপর ন্যস্ত ছিল, তথাপি তিনি কোন বিষয়ে কনিষ্ঠের সহিত বিনা পরামর্শে নির্ব্বাহ করিতেন না। উভয়ে একত্র হইয়া সময়ে সময়ে বিষয় কার্য্যোপলক্ষে মফঃস্বলে যাইতেন, এবং একে অন্যের সহিত বিনা পরামর্শে অতি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কার্য্যও নির্ব্বাহ করিতেন না। প্রকৃতপক্ষে উভয় ভ্রাতার মধ্যে অতিশয় সম্প্রীতি ছিল। জ্যেষ্ঠ নবকৃষ্ণ কালাচাঁদকে মুহূর্ত্তকালের জন্যও বিষণ্ণ দেখিলে পৃথিবী অন্ধকার-প্রায় দর্শন করিতেন। কালাচাঁদও দাদাকে প্রাণের সহিত ভক্তি করিতেন।

উভয় ভ্রাতার মধ্যে যে প্রকার সদ্ভাব ছিল, বধূগণের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। জ্যেষ্ঠা বধূ অন্নপূর্ণা, রূপে গুণে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ন্যায় ছিলেন। তিনি সরলা, মিষ্টভাষিণী এবং আত্মীয় স্বজনের প্রিয়কারিণী ছিলেন। কনিষ্ঠা বধূ তারিণী, জেষ্ঠার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি কুটিলা, পরসুখকাতরা এবং অপ্রিয়কারিণী ছিলেন। বধূগণের মধ্যে সময়ে সময়ে বিবাদ বিসম্বাদ হইত, কিন্তু স্ব স্ব স্বামীর ভয়ে কেহ অন্যের দোষারোপণ করিতে সাহসী হইতেন না।

ইতিপূর্ব্বে কালাচাঁদ সেন যশোহর জজ আদালতে নাজিরী কার্য্য করিতেন। তথায় তাঁহার যে আয় হইত তদ্দ্বারা তাঁহার খরচ সংকুলন হইত না। তিনি বাড়ী হইতে টাকা আনিবার জন্য দাদাকে পত্র লিখিতেন; নবকৃষ্ণ ও কালাচাঁদকে ঈপ্সিত অর্থ প্রদান করিতেন। কিছুকাল পরে এই কথা তাঁহার জননীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ কালাচাঁদকে লিখিলেন, যে চাকরীতে নিজের ব্যয় কুলন হয় না, সে চাকরী না করাই শ্রেয়ঃ। কালাচাঁদ অচিরাৎ চাকরী ত্যাগ করিয়া আসিলেন।

কিছুকাল অতীত হইলে পর উভয় ভ্রাতা পরামর্শ পূর্ব্বক এক দীর্ঘিকা খনন করিয়া পিতৃস্বর্গার্থ উৎসর্গ করিতে মানস করিলেন। আমাদের বাজারের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া যে খাল বহমান আছে, তৎকালে ঐ খাল অতিশয় ক্ষুদ্রায়তন ছিল; বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য কালে ক্ষুদ্র নৌকা ভিন্ন অন্য কোকা যাতায়াত করিতে পারিত না। তাঁহারা এই খাল বন্ধ করতঃ উত্তর দক্ষিণ রোকে এক জলাশয় খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই খাল আবদ্ধ করার গতিকে দেশীয় অন্যান্য তালুকদারগণের সহিত তাঁহাদের বিবাদ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষে বহুসংখ্যক লাঠিয়াল অস্ত্রাদিসহ প্রস্তুত হইল। এক পক্ষ খাল ছুটাইতে চাহেন, অপর পক্ষ তাহা নিবারণ করিতে উদ্‌যোগী। কতক দিন যাবত দুই পক্ষেই দাঙ্গা হইল, কিন্তু নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদ উভয়েই অত্যন্ত সাহসী এবং নিজেরাও লাঠি, তরবারি, বন্দুক প্রভৃতিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহারা স্বয়ং রণক্ষেত্রে উপনীত হইয়া সৈন্য চালনা করিতেন।

কয়েকদিন এই প্রকার বিবাদ হইলে বিপক্ষ তালুকদারগণ বুঝিলেন, বিবাদ করিয়া সহজে জয়লাভ করা কষ্টসাধ্য, তখন তাহারা

একটা চাতুরী করিলেন। কয়েক জন মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ স্থগিতপূর্ব্বক নিষ্পত্তির প্রস্তাব করিলেন। নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদ মধ্যস্থ ভদ্রলোকগণের কথায় বিশ্বাস করিয়া লাঠিয়ানগণকে বিদায় প্রদান করিলেন। এদিকে ধূর্ত্তগণের সুযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহারা নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদকে অসহায় দেখিয়া বহু অস্ত্রধারী লোক সংগ্রহপূর্ব্বক প্রথমে খাল মুক্ত করিয়া তাঁহাদের বাড়ী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদ বড়ই বিপদাপন্ন হইলেন। এদিকে তাঁহাদের এমন জন বল নাই, যে, এই সকল বিপক্ষগণকে পরাস্ত করিতে পারেন। বাড়ীতে যে কয়েকজন পাইক ছিল, তাহাদের সহ দুই ভাই সিংহদ্বারে উপস্থিত রহিলেন। ভাবিলেন যদি বিপক্ষগণ একান্তই বাড়ী আক্রমণ করে, তখন যে প্রতিবিধান হয়, তাহা করিবেন।

এদিকে বিপক্ষগণ, নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদকে বিপদাপন্ন দেখিয়া অতিশয় কোলাহল পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে লাগিল। এদিকে রাষ্ট্র হইল যে, বিপক্ষগণ বাজার লুণ্ঠন করিয়া ভদ্রাসন লুণ্ঠন করিতে প্রায় আগত হইয়াছে।

এই সংবাদ পাইয়া দুই ভাই আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভাবিলেন যদি মান রক্ষা করিতে না পারিলাম, তবে জীবন লইয়া কি করিব?

তখন যে কয়েকজন পাইক ছিল, তাহাদের লইয়া বিপক্ষগণের সম্মুখীন হইলেন। বিপক্ষগণ নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদকে সাক্ষাৎ অগ্নিরন্যায় আগতপ্রায় দেখিয়া বাজার লুণ্ঠন পরিত্যাগপূর্ব্বক খালের অপর তীরে উত্তীর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে ভ্রাতৃদ্বয়ও অন্য তীরে উপস্থিত হইলেন। বিপক্ষগণ তাঁহাদের ক্ষীণবল দেখিয়া তাহাদের মধ্য হইতে অনেকজন খাল লঙ্ঘন করিয়া নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদকে

আক্রমণ করিল। একজন নবকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া হস্তস্থিত প্রকাণ্ড লগুড়দ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল। কিন্তু নবকৃষ্ণের পরম প্রভুভক্ত জনৈক পাইক * প্রভুকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া নিজ মস্তকোপরি সেই আঘাত ধারণ করিয়াছিল। নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদ ভীষণ তেজের সহিত বিপক্ষদল মথিত করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা ক্ষীণবল, সুতরাং বিপক্ষগণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া নবকৃষ্ণের পক্ষ হইতে ক্রমাগত চারি পাঁচটী বন্দুকের আওয়াজ করা হইল। বিপক্ষগণের মধ্যে সেই বন্দুকের গুলিতে তিন চারিজন অস্ত্রধারী ধরাশায়ী হইল দেখিয়া অবশিষ্ট লোক ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

এদিকে এই ঘটনা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইবামাত্র পুলিষ কর্ম্মচারীতে কীর্ত্তিপাশা পরিপূর্ণ হইল। নবকৃষ্ণ, কালাচাঁদ এবং বিপক্ষ পক্ষে অনেক জন আসামী হইয়া বরিশালে চালান হইলেন। শুনিয়াছি এই মোকর্দ্দমায় নবকৃষ্ণ সাত বৎসর এবং অন্যান্য বিপক্ষগণ কেহ পাঁচ বৎসর, কেহ ছয় বৎসর হিসাবে কারাবাসের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, এবং বহু পর্য্যটন পূর্ব্বক নবকৃষ্ণ ভ্রাতাকে অব্যাহতি প্রদান করাইয়াছিলেন।

এই ঘটনার ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে নবকৃষ্ণ মহা সমারোহের সহিত তাঁহার ভ্রাতৃ-কন্যাদ্বয় এবং নিজের কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহে "চন্দন" করা হইয়াছিল। বৈদ্য-সমাজস্থ যাবতীয় কুলীনগণকে নিমন্ত্রণ-পূর্ব্বক, তাঁহাদের যথোচিত সম্মান রক্ষা করিয়া প্রত্যেকের ললাটে চন্দনের টিপ প্রদান করার নাম "চন্দন"। ইহাতে বহুতর অর্থ ব্যয় এবং নানা প্রকার আয়োজন আবশ্যক। শুনিয়াছি

---

* ইহার সন্তান সন্ততিগণ এখনও নবকৃষ্ণ প্রদত্ত ভূমি ভোগ করিতেছে।

একবার চন্দন গ্রহণ করিলে যে যত বড় কুলীন হউক না কেন, আমাদের গৃহে ভোজন করিতে কেহই আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে না।

পুরাকালে বৈদ্যকুল প্রদীপ মহারাজাধিরাজ রাজবল্লভ এই কার্য্য করিয়া অতিশয় যশস্বী হইয়াছিলেন। তারপর নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদ ব্যতীত এরূপ গুরুতর কার্য্য বৈদ্য সমাজে আর কেহ করিয়াছে, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় না। রাজা রাজবল্লভের ঘর হইতে ইহার তালিকা আনয়ন পূর্ব্বক এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল।

নবকৃষ্ণ কারাগারে গমন করিলে কালাচাঁদ জ্যেষ্ঠের শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে বরিশাল গমনপূর্ব্বক দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন।

আজ কাল ভারতবর্ষীয় জেলে যে, প্রকার কঠিন নিয়ম প্রচলিত, পূর্ব্বে এইরূপ ছিল না। সূর্য্যোদয় হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বন্দিগণ স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ কার্য্য, শয়ন, ভোজন করিতে পারিতেন এবং কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বাহিরে আসিয়া স্ব স্ব কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। নবকৃষ্ণ ও তদ্রূপ নিজের বরিশালস্থ বাসায় থাকিয়া বৈষয়িক কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন। সন্ধ্যার সময় কারাগারে গমনপূর্ব্বক সমস্ত রাত্রি তথায় আবদ্ধ থাকিতেন।

এ দিকে নবকৃষ্ণের অনুপস্থিত থাকাতে বধূগণ মধ্যে ঈর্ষানল ক্রমশঃই প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। কনিষ্ঠাবধূ স্বামীকে সর্ব্বদা জ্যেষ্ঠাবধূর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেন। ধীর কালাচাঁদ সমস্তই নীরবে সহ্য করিতেন। কোন দিনও ভ্রাতৃবধূকে কোন কথা বলিতেন না।

কালাচাঁদের দুই কন্যা ব্যতীত কোন পুত্র সন্তান ছিল না। নবকৃষ্ণের এক পুত্র ও এক কন্যা। কালাচাঁদ ভ্রাতুষ্পুত্র কালীকুমারকে

সন্তানাধিক স্নেহ করিতেন। নিজের পুত্র হইল না বলিয়া তিনি কথনই ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন না। কালীকুমারের মুখের প্রতি চাহিয়াই তিনি সে কষ্ট ভুলিয়া যাইতেন।

এই প্রকার কতিপয় বৎসর অতীত হইলে কালাচাঁদ কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হইলেন। নানা প্রকার চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু ব্যাধির ক্রমশঃ বৃদ্ধি ব্যতীত কিছুতেই হ্রাস হইল না। এক দিন কালাচাঁদ রুগ্ন শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার অন্যতম জামতা রত্নকিশোর সেন মুন্সি এবং অন্যান্য সকলে তথায় উপস্থিত হইলেন। নানা কথাবার্ত্তার পর রত্নকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ব্যারাম কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভগবান না করুন, যদি এই ব্যাধিতে আপনি স্বর্গারোহণ করেন তবে আমার শশ্রূঠাকুরাণীর কি উপায় হইবে?"

কালাচাঁদ পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছেন, যে তাহার দিন পূর্ণ হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ হাস্যবদনে উত্তর করিলেন। "আপনি যাহা বলিতেতেন, তাহা সমস্তই সত্য; এই ব্যারাম হইতে আমার আর অব্যাহতি নাই। আমার দাদা রহিলেন, আমার পুত্রতুল্য ভ্রাতষ্পুত্র থাকিল, আপনাদের কিসের কষ্ট।"

রত্নকিশোর বলিলেন,—"সে কথা সত্য। কিন্তু আপনার ঔরসজাত পুত্র নাই, তাই বলিতেছি, যে, পোষ্য পুত্রের ব্যবস্থা করিলে ভাল হইত।"

কালাচাঁদ কোন কথাই বলিলেন না, কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন করিয়া বলিলেন, "একটু চিন্তা করিয়া শেষে উত্তর করিব।"

অপরাহ্নে সকলে সমবেত হইলে কালাচাঁদ ভ্রাতষ্পুত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বৎস! আমি সমস্তই বুঝিতেছি। ইচ্ছা ছিল যে সমস্তই

তোমাকে দিয়া যাইব, কিন্তু ভগবান তোমার এবং আমার অদৃষ্টে তাহা লিখেন নাই। তথাপি আমি কখনই তোমাকে এবং আমার যে পোষ্যপুত্র হইবে, তাঁহার সহিত সমান করিতে পারিব না। তাই আমার অর্দ্ধাংশের অর্দ্ধাংশ তোমাকে যৌতুক দিলাম। দাদার এবং আমার মৃত্যুর পর তুমি ষোল আনীর বার আনী এবং আমার পোষ্য-পুত্র চারি আনী পাইবে।" এই কথা বলিয়া, তিনি নিস্তব্ধ হইলেন।

রত্নকিশোর এবং অন্যান্য অনেকেই তখন সেই প্রকোষ্ঠে উপস্থিত ছিলেন। তাহারা এই কথা শুনিলে পর রত্নকিশোর বলিলেন, "যদি পোষ্যপুত্র রাখিবারই আপনার অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে এরূপ আদেশ করিলে, তাহাকে পথের ভিখারী করিতে হয়।"

কালাচাঁদ বলিলেন, "কালীকুমারের সহিত আমি কিছুতেই আমার পোষ্যপুত্রকে সমান করিতে পারিব না। এই প্রকার অনেক বাগবিতণ্ডার পর, কালাচাঁদ বলিলেন, "আচ্ছা, তোমাদের কথায় আমি কালীকুমারকে আমার অর্দ্ধাংশ হইতে দুই আনী দিলাম, অবশিষ্ট ছয় আনী আমার পোষ্যপুত্রের জন্য রহিল।" অনেকেই তাঁহার এই বাক্য অন্যথা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কালাচাঁদ কিছুতেই তাহা শুনিলেন না। পোষ্যপুত্র রাখিবার অনুমতি দিয়া কালী-কুমারকে স্বীয় অংশ হইতে দুই আনি যৌতুক প্রদান লিপিবদ্ধ করিলেন।

উল্লিখিত ঘটনার কিয়ৎ দিবস পরে নবকৃষ্ণের বুকে বজ্রাঘাত করিয়া আত্মীয় স্বজনকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া ১২২৮ সালের পৌষ মাসে কালাচাঁদ স্বর্গারোহণ করিলেন।

কালাচাঁদ মজুমদার মহাশয় স্বর্গারোহণ করিলেন পর, তাঁহার ভাগিনেয়গণ এবং জামতা রত্নকিশোর বিষয় কার্য্য রক্ষণাবেক্ষণের

ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময় হইতেই গৃহ বিবাদের সূত্রপাত হইল।

কালাচাঁদের আদ্যকৃত্য সম্পন্ন হইবার অব্যবহৃতি পরে তাঁহার স্ত্রী তারিণী, ভাগিনেয়গণকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা রতনের নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া, কেহ কোন মফঃস্বলে যাইবা না, অথবা কেহ কোন স্থান হইতে টাকা আদায় করিবা না। রতনকেই সর্ব্বময় কর্ত্তা করিব।"

তাঁহার এই বাক্যে ভাগিনেয়গণ অত্যন্ত ব্যথিত ও কোপাবিষ্ট হইলেন, এবং এই সমস্ত বৃত্তান্ত নবকৃষ্ণকে জ্ঞাপন করিবার জন্য তাঁহারা বরিশাল উপস্থিত হইলেন।

এদিকে কনিষ্ঠের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া, নবকৃষ্ণ এতদূর শোকাভিভূত হইলেন, যে তাঁহার উত্থানশক্তি রহিত হইল। সর্ব্বদা মৃতভ্রাতার জন্য অশ্রু বর্ষণ করিতেন। স্নানের সময় স্নান, আহারের সময় আহার করিতেন না; সুতরাং তাঁহার শরীর এতাদৃশ কৃশ এবং দুর্ব্বল যে, তিনি বিনা অবলম্বনে শয্যা হইতে উঠিতে পারিতেন না।

অচিরাৎ ৺ নীলচন্দ্র সেন এবং অন্যান্য ভাগিনেয়গণ সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট নিবেদন করিয়া বলিলেন "হয়, আমাদের রাখুন, নয় রতনকে রাখুন। আমরা আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত। কিন্তু ৺ রাজারাম সেনের দৌহিত্র হইয়া কিছুতেই সামান্য রতন-মুন্সির আজ্ঞার দাস হইতে পারিব না! আপনার অনুমতি পাইলে তাহাকে দূর করিয়া দিতে আমাদের মুহূর্ত্তকাল সময় লাগে না।"

বিচক্ষণ নবকৃষ্ণ সমস্তই বুঝিতে পারিলেন; তাঁহাদের গৃহবিচ্ছেদ হইবার যে, আর বিলম্ব নাই, তাহা তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারি-লেন। কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বনে থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ

পূর্ব্বক বলিলেন—"আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম কালাচাঁদ যখন আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, তখন ওরূপ ঘটনা ঘটিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? তোমরা আমার বাড়ী আগমনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, যাহা করিতে হয়, আমি স্বয়ং নির্ব্বাহ করিব। আমার কারামুক্তি হইবার আর অল্প কয়েক মাস অবশিষ্ট আছে।"

এই সারগর্ভবাক্য তাহাদের মনঃপুত হইল না। তাঁহারা কীর্ত্তি-পাশা আগমন পূর্ব্বক, রতন মুন্সিকে দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক দিকে ভাগিনেয়গণ, অপর দিকে জামাতৃগণ। অচিরাৎ উভয় পক্ষে অত্যন্ত মনোবিবাদ উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষেই বিস্তর লোক যুটিল, অচিরাৎ উভয় পক্ষেই পৃথগান্ন হইলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই নবকৃষ্ণ কারামুক্ত হইয়া দেশে আগমন করিলেন। বাড়ী পঁহুছিয়া মৃত ভ্রাতার জন্য তিনি এতদূর শোকাকুল হইয়াছিলেন, যে সপ্তাহ মধ্যে জল স্পর্শও করিয়াছিলেন না। ক্রমে শোকের বেগ মন্দীভূত হইলে, তিনি ভ্রাতৃবধূর সহিত একান্নভুক্ত হইতে চাহিলেন। কিন্তু ৺ তারিণী চৌধুরাণী জামাতৃ-গণের প্ররোচনায় কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। মহা বুদ্ধিমান, বহু-দর্শী নবকৃষ্ণ বুঝিলেন যে, তারিণীর মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করা না হয়, তবে সমস্ত সম্পত্তি জামাতা এবং দৌহিত্রগণের সত্ব হইবে; অথবা স্ত্রীলোক পাইয়া জামাতৃগণ স্ব স্ব অন্ধিসন্ধি সিদ্ধি করিবার উপযুক্ত অবসর অন্বেষণ করিতেছে।

নবকৃষ্ণ তখন ভ্রাতার অনুমতি পত্রের অনুযায়ী, তারিণী চৌধু-রাণীকে এক পোষ্যপুত্র আনিয়া দিলেন। ইহার নাম ৺ চন্দ্র-কুমার সেন।

এই সময় হইতেই উভয় পক্ষের আদায় তহসীল পৃথকভাবে

চলিতে লাগিল। রতন মুন্‌নি, বালকের প্রাপ্তবয়স না হওয়া পর্য্যন্ত বিষয় সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৮ চন্দ্রকুমার সেন এবং তাঁহার সন্তানগণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বর্ণন করিয়া নবকৃষ্ণের অবশিষ্ট জীবনী বর্ণন করিব।

(চন্দ্রকুমার সেন মজুমদার)

চন্দ্রকুমার বাবুকে যখন পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হয়, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম এক বৎসর কি দুই বৎসরের ন্যূন নহে। ইঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার মাতা এবং ভগ্নীপতি বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। কয়েক বৎসর অতীত হইলে তারিণী চৌধুরাণী "তুলা" করিয়াছিলেন। তুলাযন্ত্রের এক দিকে, যিনি কর্ম্মকর্ত্তা, তিনি উঠিলেন অপর দিকে ভার সমান করিবার জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ইত্যাদি ধাতু দ্রব্য দ্বারা ওজন করা হইত। সেই সমস্ত ধাতু দ্রব্য ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য দীন দুঃখীকে বিতরণ করা হইত। শুনিয়াছি এই উপলক্ষে নানা দেশীয় পণ্ডিতগণ আহূত হইয়া শুভ কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

তারিণী চৌধুরাণীর স্বর্গারোহণ করার পর চন্দ্রকুমার বাবু স্বয়ং বিষয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত সরল, বৈষয়িক কুটিলতা বুঝিতে সক্ষম হইতেন না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী,—এবং তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। চন্দ্রকুমার বাবুকে বৈষয়িক কার্য্যে অক্ষম দেখিয়া, কর্ম্মচারিগণ নানা প্রকার চাতুরী দ্বারা অর্থাপহরণ করিতে লাগিল। চন্দ্রকুমার বাবুর স্ত্রী, এই সমস্ত জানিতে পারিয়া, স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ইঁহার বৈষয়িক বুদ্ধি এবং তেজস্বিতা প্রশংসার যোগ্য। নিজ হস্তে বিষয় কার্য্যের ভার গ্রহণ

করিয়া, অনেক সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আমার পিতামহ এবং পিতৃদেবের জীবনীর ইতিহাসের মধ্যে ইঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে হইবে, সুতরাং এস্থানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

৺ চন্দ্রকুমার বাবু এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে আমি দেখিয়াছি, আমার বয়স যখন ১১ বৎসর কি ১২ বৎসর তখন ৺ চন্দ্রকুমার বাবু স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। ইনি সম্পর্কে আমার খুল্লপ্রপিতামহ।

৺ চন্দ্রকুমার বাবুর দুই কন্যা * ব্যতীত ঔরসজাত কোন পুত্র-হইলনা, দেখিয়া পৌষ্যপুত্র গ্রহণ করা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু শশিকুমার রায় চৌধুরি, চন্দ্রকুমার বাবুর পোষ্যপুত্র।

দশ এগার বৎসর হইল, শশিবাবুর মাতা প্রায় পঞ্চসত্বারিংশৎ বৎসর বয়সে স্বজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন।

শশিবাবু বৈষয়িক কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া, দিন দিন স্বীয় সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। ইনি কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান এবং সদ্বক্তা ইংরেজী এবং বাঙ্গালা লেখাপড়ায় বিশেষ পরিদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে, ইনি অতিশয় ব্যুৎপন্ন, পাখোয়াজ এবং তবলা বাজাইতে রায়েরকাঠির রাজবংশের অন্যতম বংশধর শ্রীযুক্ত রাজা নরনারায়ণ রায় মহাশয়ের পর ইঁহার ন্যায় বাখরগঞ্জ জেলায় দ্বিতীয় কেহ আছেন কি না সন্দেহ। শশিবাবু নিজে একজন সঙ্গীত রচয়িতা; তাঁহার প্রণীত হরিসঙ্কীর্ত্তনগুলি বড়ই মধুর এবং হৃদয়গ্রাহী।

সন১৩০১ সালের ১৭ই পৌষ শশিবাবুর সরলা সহধর্ম্মিণী দুই পুত্র এবং চারি কন্যা রাখিয়া ৩৭ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

---

* ১ম কন্যার সন্তান	২য় কন্যার সন্তান
গিরিজানন্দসেন	তারাপ্রসন্ন, জ্ঞানদাপ্রসন্ন

ইনি অতিশয় পুণ্যবতী, দয়াশীলা, এবং পতিপরায়ণা কামিনী ছিলেন। বহুদিন কঠিন রোগে শয্যাশায়িনী থাকিয়া অবশেষে সকল যন্ত্রণা হইতে চিরদিনের জন্য অব্যাহতি পাইয়াছেন।

নবকৃষ্ণ, বিধবা ভ্রাতৃবধূকে পোষ্যপুত্র রাখিয়া দিয়া নিজ পুত্র অপেক্ষাও তাহাকে অধিক স্নেহ করিতেন। কিন্তু তাঁহার এই স্নেহ এবং যত্ন অকৃত্রিম হইলেও, তাঁহার ভ্রাতৃবধূ অন্যের প্ররোচনায় পুত্রকে তাহার জ্যেষ্ঠতাতের নিকটে যাইতে দিতেন না। নবকৃষ্ণ এই সমস্ত ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেও, কোন দিন কোন প্রকার অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই।

কতিপয় বৎসর অতীত হইলে, নবকৃষ্ণ বাৎসরিক পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ করিবার বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, শোভাবাজারের রাজবাড়ী হইতে নবকৃষ্ণ স্বয়ং ছদ্মবেশে গমন পূর্ব্বক, এই শ্রাদ্ধের তালিকা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। সুদূর হরিদ্বার বদরিকাশ্রম হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত এবং নেপাল হইতে কুমারীকা অন্তরিপ পর্য্যন্ত যাবতীয় শাস্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে এই শ্রাদ্ধকার্য্যে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত পণ্ডিতমণ্ডলী এবং অন্যান্য ভদ্রলোকের জন্য নিজ বাড়ীতে এবং দেশ মধ্যস্থ অন্যান্য স্থানে উপযুক্ত গৃহাদি এবং বাসোপযোগী অন্যান্য সামগ্রীর বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি এই কার্য্যের এক মাস কি দেড়মাস পূর্ব্বে ভাটপাড়া, নবদ্বীপ, বারাণসী, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান হইতে কয়েকজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পূর্ব্বেই আগমন করিয়া, এই বৃহৎ কার্য্যের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুইটী বৃহৎ হস্তী, দুইটী বৃহৎ অশ্ব, দুইখানি বৃহৎ তরণী দান করিবার জন্য আনয়ন করা হইল। ঢাকা হইতে প্রসিদ্ধ কর্ম্মকার আনাইয়া

বিশুদ্ধ স্বর্ণ দ্বারা দুইটী—"দানসাগর" নির্ম্মাণ করাইলেন।—মণিমুক্তা খচিত মহার্ঘ চন্দ্রাতপ কাশ্মীর হইতে নির্ম্মিত হইয়া আসিল।

এদিকে অন্যান্য আয়োজন প্রায় সমাধা হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় নবকৃষ্ণ অতিশয় কঠিন রোগাক্রান্ত হইলেন। কারাবাসে থাকা সময় হইতেই মানসিক দুশ্চিন্তায় এবং নিদারুণ ভ্রাতৃশোকে তাঁহার স্বাস্থ্য কতকটা ভঙ্গ হইয়াছিলেন। ভ্রাতার পোষ্যপুত্রকে লইয়া যদি একত্র থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলেও দগ্ধহৃদয়ে অনেকটা শান্তি উপভোগ হইত; কিন্তু ঈশ্বর তাহাতে বাম। নিদারুণ মনঃপীড়ায় তাঁহার বল ক্ষয় হইয়াছিল। তথাপি অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত সমস্ত সহ্য করিতেছিলেন। কিন্তু ক্ষণ-ভঙ্গুর শরীর এত অত্যাচার আর সহ্য করিতে পারিল না। অচিরাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

নবকৃষ্ণ পীড়িত হইলে পর, আত্মীয়-স্বজনগণ অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইলেন। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি-প্রতিম স্বর্গীয় গৌরচন্দ্র কবিভূষণ, এবং দেশস্থ অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত যত্ন বৃথা হইতে লাগিল। নবকৃষ্ণের পীড়া দিন দিন ভয়ানক আকার ধারণ করিতে লাগিল।

এদিকে শ্রাদ্ধের দিন অতি নিকটবর্ত্তী হইল। নানাদিগ্‌দেশ হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলী, কীর্ত্তিপাশায় উপস্থিত হইলেন। নবকৃষ্ণ মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া পুত্র কালীকুমার, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে বলিলেন "আমার চিকিৎসা এবং শুশ্রূসার জন্য যেরূপ লক্ষ্য করিবে, নিমন্ত্রিত লোকগণ এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ততোধিক যত্ন এবং অভ্যর্থনা করিবে।"

উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী, নবকৃষ্ণের এই প্রকার প্রাণান্তিক অবস্থা

দর্শন করিয়া সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাঁহার আরোগ্য কামনা জন্য বেদপাঠ, যজ্ঞ এবং অন্যান্য স্বস্ত্যয়ন হইতে লাগিল; কিন্তু কালের অবশ্যম্ভাবী গতি কে ফিরাইতে পারে? নবকৃষ্ণের দিন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল।

শ্রাদ্ধের ২।৩ দিন বাকী আছে, এমন সময় নবকৃষ্ণের পীড়া অতিশয় সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল।

তিনি ক্ষীণকণ্ঠে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস!" আমার আর অনেকক্ষণ সময় বাকী নহে! কিন্তু মনে এই বড় ক্ষোভ লইয়া মরিতে হইল যে আমার পিতৃকার্য্য শেষ করিয়া মরিতে পারিলাম না। তুমি এখন প্রাপ্তবয়স্ক, আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, "যে, এই উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ রিক্তহস্তে দেশে প্রত্যাগমন না করেন।"

কালীকুমার বাবু অশ্রুপূর্ণলোচনে পিতৃবাক্য পালন করিবেন, অঙ্গীকার করিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার সময়ে, সকলকে কাঁদাইয়া নবকৃষ্ণ স্বর্গারোহণ করিলেন।

এই হৃদয় বিদারক ঘটনা অচিরে প্রকাশিত হইলে চতুর্দ্দিকে একটা বিপদসূচক কোলাহল উত্থিত হইল। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও অন্যান্য সকলে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন।

কালীকুমার বাবু, পিতার দেহ ত্যাগ হইবামাত্র গলদশ্রু লোচনে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্যান্য সকলের নিকট করযোড়ে বলিলেন, "আমার স্বর্গীয় জনক বহু আশা করিয়া আপনাদের চরণ পূজা করিতে আনিয়াছিলেন, কিন্তু সে সুখ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল না। আপনারা যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার পিতৃদেবের আদ্যকৃত্য পর্য্যন্ত অপেক্ষা

করেন, তাহা হইলে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবর মানসিক আশা কতক পরিমাণ সফল হইবার সম্ভব।”

কালীকুমার বাবুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, “যাই” কেহ বলিলেন “অন্ততঃ কয়েকটা দিন অপেক্ষা করিয়ে গেলে দোষ কি?” কিন্তু কালীকুমার বাবু প্রত্যেকের নিকট অত্যন্ত কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং অন্যান্য ভদ্রলোকগণ ৺ নবকৃষ্ণের আদ্যকৃত্য পর্য্যন্ত কীর্ত্তিপাশায় অবস্থান করিতে স্বীকৃত হইলেন।

কালীকুমার বাবু তৎক্ষণাৎ সকলের উপযুক্ত বাসস্থান, খাদ্য দ্রব্য এবং ভৃত্যাদি নিয়োজিত করিয়া উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

এ দিকে নবকৃষ্ণের প্রাণ দেহ হইতে বিযুক্ত হইলে, তদীয় স্বাধ্বী সহধর্ম্মিণী অন্নপূর্ণা, স্বামী-সহগামিনী হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। একে শেলসম দারুণ পিতৃশোকে, কালীকুমারের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দগ্ধ হইতেছিল। তারপর আবার প্রত্যক্ষ স্নেহরূপিনী মাতৃদেবী ও তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়াছেন। কালীকুমারের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি ভূলুণ্ঠিত পুত্রকে উঠাইয়া স্বীয় ক্রোড়োপরি উপবেশন করাইয়া বলিলেন “বৎস! আমি আজ যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। নারী জাতির ইহা হইতে আর সৎকার্য্য কি আছে? তুমি আমার এক মাত্র পুত্র, আজ যে, তোমাকে রাখিয়া যাঁহার দাসী ছিলাম, তাঁহার সঙ্গে যাইতেছি, ইহা তোমার এবং আমার উভয়েরই পক্ষে প্রার্থনীয়। তুমি নির্ব্বোধ নও এবং তোমাকে আমরা অপার ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর করিয়া যাইতেছি, তুমি এরূপ বালকের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিয়া কেন

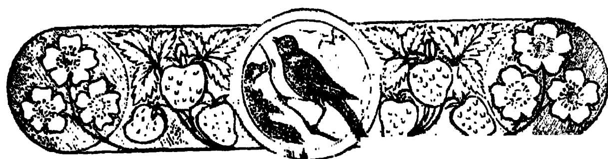
আমাদের সদ্‌গতির ব্যাঘাত জন্মাও। পিতা মাতা কাহারই চিরকাল থাকে না; তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইও না।” কালীকুমার বাবু এই প্রবোধ বাক্যে আরও অধীর হইয়া পড়িলেন। মাতার শ্রীচরণে মুখ বিন্যস্ত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন হইল। নবকৃষ্ণের শবদেহ সঙ্গে লইয়া পতিপ্রাণা অন্নপূর্ণা শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বাঙ্গ স্নুবর্ণালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া মহার্ঘ পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ধর্ম্ম পত্নীর কর্ত্তব্যপালন করিলেন। দুই মহাপ্রাণ একত্রে মিলিত হইয়া বিশ্বপতির চরণতলে উপস্থিত হইলেন।

নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদ পিতৃপুরুষগণের ন্যায় ততদূর ধার্ম্মিক না হইলেও, তাঁহাদের বংশের উপযুক্ত সন্তান হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অসাধারণ প্রতিভা বলে ভূসম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল। যেমন বিষয়সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি অনেক গুলি লোক-হিতকর কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। আমাদের বাজারের দক্ষিণ হইতে বরাবর ঝালকাঠি পর্য্যন্ত এক প্রশস্ত বর্ত্ম-নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; যদিও সেই রাস্তার মধ্যে এখন অনেক গৃহস্থ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে, তথাপি স্থানে স্থানে ইহার চিহ্ন এখনও দেদীপ্যমান। এই প্রশস্ত রাস্তা আমাদের বাজার হইতে ঝালকাঠি পর্য্যন্ত যে যে স্থান দিয়া গিয়াছে, তাহাতে অনুমান করা যায়, যে, ইহা দৈর্ঘ্যে ৫।৬ মাইলের কম নহে।

একদা নবকৃষ্ণ এবং কালাচাঁদ গঙ্গাস্নানার্থ কলিকাতায় গমন করেন। ৺কালীবাড়ী মানসিক পূজা এবং বলিদান প্রদান করিবার সময়, তথাকার হালদার পুরোহিতগণের সহিত তাঁহাদের এই সম্বন্ধে কি বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। হালদারগণ নাকি ঠাট্টা করিয়া

বলিয়াছিলেন যে, নবকৃষ্ণ এত কি বড় লোক যে একাই দেবীপূজার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় তারপর দিন বিপুল আয়োজনের সহিত মহামায়ার পূজা প্রদান করিয়া, উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত বলি প্রদান করিয়াছিলেন। এবং দেবীর আপাদ মস্তক স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া দিয়াছিলেন। অদ্যাপি কালীঘাটে, "পাঁঠাকাটা" নবকৃষ্ণ বলিয়া তিনি বিখ্যাত। ১২৩৩ সালে ৬৯ বৎসর বয়সে পৌষ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে তিনি স্বজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

৺ বাবু কালীকুমার সেন।

সন ১২১৩ সালে কালীকুমার বাবু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যখন নবকৃষ্ণ এবং তদীয় সহধর্ম্মিণী স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তখন কালীকুমারের বয়স অষ্টাদশ কি উনবিংশ বৎসর হইবে। পিতৃ মাতৃ শোকের সহিত, আর একটী গুরুতর আরব্ধ কার্য্যের ভার তাঁহার প্রতি ন্যস্ত ছিল। তিনি সেই কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য ত্বরায় পিতৃ মাতৃ শোক বিস্মৃত হইয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ এবং তাঁহার পত্নীর আদ্যকৃত্য পর্য্যন্ত তৎকর্ত্তৃক আহূত যাবতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীকে কালীকুমারবাবু অতিশয় যত্ন এবং শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

এদিকে নিরূপিত দিবসে কালীকুমারবাবু পিতৃকৃত্য 'সোনার দানসাগর' পিতামহ এবং পিতামহীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া, পিতা এবং মাতার উদ্দেশ্যে একটী সোনার এবং আর একটী রূপার দানসাগর উৎসর্গ করিলেন। তারপর যথা নিয়মানুসারে হস্তী, ঘোটক, নৌকা, বিলক্ষণ পাল্কী, শিল্পচক্র প্রভৃতি উৎসর্গ শেষ হইলে অতিশয় পরি-

পাটীরূপে ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইয়াছিল। আহূত পণ্ডিতগণকে দূরত্ব অনুসারে কাহাকেও আটশত, কাহাকেও পাঁচশত মুদ্রা নগদ দানে বিদায় করা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীতও নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান পণ্ডিতমণ্ডলীকে গুণানুসারে "স্বতন্ত্র বিদায়" প্রদান করা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন দেশীয় পণ্ডিতগণকে ২৬ টাকা হারে দান, সিধা, পাথেয় ইত্যাদি দ্বারা পরিপাটীরূপে বিদায় করা হইয়াছিল।

এই কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলারূপে নির্ব্বাহ হইলে, কালীকুমার বাবুর যশঃ এবং কীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ভট্ট কবিগণ এই কার্য্য সম্বন্ধে অতি সুললিত কবিতা রচনা করিয়া দেশে তাঁহার পুণ্য কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। শুনিয়াছি, এই কার্য্যে কালী-কুমার বাবুর প্রায় সার্দ্ধ দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কালীকুমার বাবু চারি বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। পিতা পিতামহাদির ন্যায় দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিলে যে, তিনি অনেক পুণ্য কার্য্য করিতে পারিতেন তাহার আর সন্দেহ নাই।

অশৌচান্তে কালীকুমার বাবু অতিশয় মনোযোগ সহকারে বৈষয়িক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত সম্পত্তির বন্দোবস্ত বাকী ছিল, তাহার বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সমুদায় কার্য্য শেষ করিতে পারিলেন না।

শুনিয়াছি যে, কালীকুমার বাবু অতিশয় বলবান লোক ছিলেন। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যেরূপ দৃঢ় ছিল, ততোধিক কমনীয় এবং সুন্দর ছিল। তাঁহার শারীরিক সামর্থ্য সম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে।

একদা কালীকুমার বাবু স্নান করিতেছেন, এমন সময় আমাদের বাহির বাড়ীর পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ে একটা বেতসীলতা ধরিয়া তিন চারি জনে টানাটানি করিতেছে। কালীকুমার বাবু বলিলেন "তোমরা এই কয়জনে একত্র হইয়া একটা বেত টানিয়া বাহির করিতে পারিতেছ না, দেখ আমি একাই উহা টানিয়া আনিতেছি।" তিনি বেত ধরিয়া এমন টান দিলেন যে, উহা একটী বৃহৎ আম্র শাখার সহিত ভগ্ন হইয়া সশব্দে নীচে পড়িল। তাঁহার এই অলৌকিক শক্তি দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

আর একদিন তিনি অপরাহ্নে কতিপয় পারিষদের সহিত বায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে, আমাদের ৺ সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীর সম্মুখে একখানি হাড়িকাঠ (যুপকাষ্ঠ) উঠাইতে দুইজন লোক চেষ্টা করিতেছে। কালীকুমার বাবু বলিলেন, "তোমরা এই দুইজন কতক্ষণ যাবৎ ইহা উঠাইতে চেষ্টা করিতেছ?

তন্মধ্যে এক জন বলিল "এই হাড়িকাঠ প্রায় দুই তিন বৎসর যাবৎ এই স্থানে রহিয়াছে, ইহা নষ্ট হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য উঠাইতেছি। আমরা দুইজনে প্রায় ছয়দণ্ড কাল পরিশ্রম করিতেছি, তবু উহা উঠাইতে পারিতেছি না।"

কালীকুমার বাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া, সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক বলিলেন "তোমরা যে পরিমাণ মৃত্তিকা উঠাইয়াছ, উহা আবার যথাস্থানে সন্নিবেশিত কর।" তাহারা সেই প্রকার করিলে, কালীকুমার বাবু স্বয়ং সেই হাড়িকাঠের মধ্যে গলা দিয়া, অন্য একজনকে একখান অর্গলদ্বারা তাহা আবদ্ধ করিতে বলিলেন। তারপর প্রভূত বলের সহিত, সেই হাড়িকাঠ লইয়া, দণ্ডায়মান হইলেন। এই প্রকার

অমানুষিক বলের বিকাশ দেখিতে পাইয়া সকলে বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহার শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

৺ নবকৃষ্ণ মজুমদার মহাশয় জীবিত থাকা সময়ে খান্দারপাড় নিবাসী ৺ কৃষ্ণকান্ত সেনের কন্যার সহিত কালীকুমার বাবুর শুভ পরিণয় সম্পাদন হইয়াছিল। তাঁহার পত্নীর নাম হরসুন্দরী। তিনি প্রকৃত পক্ষেই হরসুন্দরী ছিলেন। সাক্ষাৎ ভগবতীর ন্যায় তাঁহার রূপচ্ছটা এবং সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় তিনি স্বামীর প্রিয়কারিণী ছিলেন। সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় স্বামীর পদানুসরণ করিতেন, এবং ইঙ্গিত মাত্রেই তাঁহার আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতেন। কালীকুমার বাবু পত্নীর সেবায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। হরসুন্দরী যে কেবল স্বামী-সেবায় কালাতিপাত করিতেন, তাহা নহে। দীন দরিদ্রদিগকে অন্নদান, গো, ব্রাহ্মণ, অতিথিগণের সেবা, কুটুম্ব এবং কুটুম্বিনীগণের অভ্যর্থনা ইত্যাদি দ্বারা তিনি লোকসমাজে অতিশয় যশস্বিনী হইয়াছিলেন।

অকস্মাৎ কালীকুমার বাবুর কঠিন পীড়া উপস্থিত হইল। প্রবল বেগশালী জ্বর, তৎসহ কাশ (Pneumonia) এবং অন্যান্য উপসর্গ উপস্থিত হইল। প্রথম সামান্য সর্দ্দি প্রকাশ হইয়াছিল। কালীকুমার বাবু তাহা বড় গ্রাহ্য না করিয়া স্নান আহার করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ সেই সর্দ্দি ভয়ানক জ্বর কাশে পরিণত হইল। ৺ গৌরচন্দ্র কবিভূষণ রোগের অবস্থা দর্শন করিয়া অতিশয় ভীত হইলেন। অন্যান্য চিকিৎসকগণ আসিলেন, রোগের পূর্ণবিকাশ অবলোকনে হতাশ হইয়া পড়িলেন।

হরসুন্দরী এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বামীর পদপ্রান্ত হইতে স্থানান্তরে গমন করেন নাই। তিনি যুবতী, অসংখ্য গুরুজনের সম্মুখে লজ্জা ত্যাগ করিয়া এক মনে স্বামী-সেবায় নিযুক্তা। স্বামীর পীড়া যে

দিন দিন কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে, হরসুন্দরী তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও হতাশ হইলেন না; বরং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে প্রবৃত্তা হইলেন।

এদিকে রোগের অবস্থা অত্যন্ত সাংঘাতিক ভাব ধারণ করিলে এক দিন গুরুদেব ৺ রামকিঙ্কর তর্কভূষণ, ৺ নন্দদুলাল ভট্টাচার্য্য, ৺ শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, দেওয়ান ৺ কিশোরচন্দ্র সেন মহলানবিশ, ৺ নীলচন্দ্র সেন প্রভৃতি অন্যান্য অমাত্যবর্গ, কালীকুমার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার ঔরসজাত কোন সন্তান হইল না; ঈশ্বর না করুন, যদি এই রোগ হইতে আপনি মুক্তি লাভ না করেন, তবে সম্পত্তি রক্ষার কি উপায় হইবে?"

কালীকুমার বাবু পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন, যে, তাঁহার এ যাত্রা অব্যাহতি নাই; তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন "আপনাদের অভিপ্রায় হইলে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিতে পারেন। আর সেই পুত্রের উপযুক্ত বয়ঃক্রম না হওয়া পর্য্যন্ত, আপনি রামকিঙ্কর তর্কভূষণ, ও নন্দদুলাল ভট্টাচার্য্য গুরুদেব, আমার এই বিষয় সম্পত্তি উছিস্বরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।"

তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ হইয়া সকলকে স্বাক্ষর করান হইল।

হরসুন্দরী স্বামীর পদপ্রান্তেই অবগুণ্ঠনে আবৃতা হইয়া তাঁহার চরণ-সেবা করিতেছিলেন। তাঁহার কর্ণে এই বাক্য প্রবেশ করিলে, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ হইতে একটী বাক্যও উচ্চারিত হইল না। একমনে নত বদনে স্বামীর পদসেবা করিতে লাগিলেন।

নিশীথ সময়ে অন্যান্য সকলে নিদ্রিত আছেন, এমন সময় হর-

সুন্দরী স্বামীর নিকট বলিলেন, "এতদিন তোমার কৃপায় অশেষ সুখভোগে কালাতিপাত করিয়াছিলাম, তোমার কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, আমার একটী অনুরোধ, আজ্ঞাকর, যে, তাহা তুমি প্রতিপালন করিতে অনুমতি প্রদান করিবে। তাহা হইলে, আমি তোমার শ্রীচরণ সমীপে তাহা ব্যক্ত করিব।"

কালীকুমার বাবুর তখন দিব্যচৈতন্য বর্ত্তমান ছিল। তিনি পত্নীকে নিকটে আসিতে বলিলেন "হরসুন্দরী নিকটে বসিলে কালীকুমার বাবু তাঁহার হস্ত নিজ প্রকোষ্ঠ মধ্যে স্থাপন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন" বহুভাগ্যফলে তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণীরত্ন লাভ করিয়াছিলাম। মনে এই বড় দুঃখ রহিল যে, আজ তোমায় সম্পূর্ণ অনাথিনী করিয়া চলিলাম। তোমার যদি একটী শিশু সন্তানও থাকিত, তাহা হইলেও হৃদয়ে কতকটা শান্তি-উপভোগ করিতে। হায়! জগদীশ্বর আমাদের প্রতি বাম হইয়াছেন।"

কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বনে থাকিয়া, আবার বলিলেন "এতদিন তোমাকে আমি হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিয়াছিলাম, কোন দিনও তোমার কোন সাধ পূর্ণ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। আজ মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছি, তুমি যাহা বলিবে, অবশ্যই তাহা অনুমোদন করিব।"

হরসুন্দরী বলিলেন, "আমিও মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, তোমার ন্যায় স্বামীরত্ন লাভ করা বহু তপস্যার ফল। এতদিন তোমারই শ্রীচরণ সেবা করিয়া মহা সুখে কালাতিপাত করিয়াছিমাম। আজ তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছ, অনুমতি কর, যে, দাসীও তোমার সহগামিনী হউক। তোমার বিহনে আমি এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইব না।"

কালীকুমার বাবু পত্নীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চমকিত হইলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন "তুমি বালিকা, তোমার এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ তুমি চলিয়া গেলে, এই বিপুল সম্পত্তি কে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ?"

হরসুন্দরী বলিলে,—"আমার সমস্তই তুমি, তোমাকে ছাড়া এ জীবনে অন্য কিছুই কামনা করি নাই। তোমাকে ছাড়িয়া আমি তিলার্দ্ধ জীবন ধারণ করিতে পারিব না। অতএব দাসীর প্রার্থনা পূর্ণ কর।" এই বলিয়া সতী স্বামীর যুগলচরণ বক্ষে ধারণ করিলেন।

কালীকুমার বাবু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তোমার এই সৎ-ইচ্ছায় বাধা প্রদান করিয়া পাপে লিপ্ত হওয়া সঙ্গত নহে। কিন্তু আমি যাহা যাহা বলিলাম, তাহা একটু বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ কর, তাহা করিও।"

হরসুন্দরী অশ্রু নিষিক্ত সুন্দর মুখ খানি প্রফুল্ল হইল। তিনি বলিলেন, "আমি বিশেষ চিন্তা না করিয়া তোমার নিকট অনুমতি প্রাথনা করি নাই।"

নিকটে কালীকুমার বাবুর বিশ্বস্তা দাসী পুষ্পী ছিল, দম্পতির কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, সে ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

তার পর দিন প্রাতঃকালে, কীর্ত্তিপাশা গ্রাম অন্ধকার করিয়া ২২ বৎসর বয়সে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কালীকুমার বাবু স্বর্গারোহণ করিলেন।

সকলে শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় তাঁহারা সভয়ে দেখিতে পাইলেন যে মৃত বাবুর পার্শ্বে আলুলায়িত কুন্তলা সর্ব্বাভরণ ভূষিতা এক রমণী মূর্ত্তি বসিয়াছেন।

সকলেই চিনিলেন যে পতিপ্রাণা সতী পতির মৃত দেহ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ সাবিত্রীর ন্যায় কৃতান্ত কবল হইতে মৃত পতিকে বাঁচাইবার জন্যই যেন উপবেশন করিয়াছেন।

গুরুদেব ৺ রামকিঙ্কর তর্কভূষণ গলদশ্রু লোচনে বলিলেন 'মা!' একি, তুমি এই ভাবে এই স্থানে কেন রহিয়াছ?"

সতী বলিলেন, "দেব! আমার ইঁহার পার্শ্বে বসিবার স্থান ভিন্ন আর দ্বিতীয় স্থান কোথায় আছে? আপনারা আর বিলম্ব করিতেছেন কেন, ত্বরায় আমাদের মহা প্রস্থানের উদ্যোগ করুন।"

গুরুদেব এবং অন্যান্য সকলে শিহরিয়া উঠিলেন। কেহ কোন বাক্য প্রয়োগ করিলেন না। সাধ্বী আবার বলিলেন, "আপনারা কি আমার কথা শুনিতে পাইতেছেন না? শীঘ্র আয়োজন করুন। ঐ দেখুন আমার জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছেন।"

গুরুদেব কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'মা'! তুমি ধৈর্য্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি, অত অধীরা হইও না। তুমি বয়সে বালিকা হইলেও বুদ্ধিতে অতি প্রবীণা। তোমার এই কিশোর বয়সে এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাই যুক্তিসঙ্গত। দেখ তোমার এই অতুল ঐশ্বর্য্য, অগণিত দাসদাসী রহিয়াছে। ইহাদের ফেলিয়া, আমাদের একেবারে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়া, মা লক্ষ্মি! তুমি কোথায় অন্তর্হিতা হইতেছ? তুমি আমাদের জননী, এতগুলি সন্তানকে মাতৃহীন করিয়া তোমাকে যাইতে দিব না।"

গুরুদেব অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। সতী শিরোমণি বলিলেন, "গুরুদেব! আপনি আমাদের পরম পূজ্য, শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বর তুল্য, আপনি পণ্ডিত হইয়া কি প্রকারে আমাকে এই ধর্ম্ম

হইতে বিরত করিতেছেন? আমার প্রাণ ত তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, শুধু দেহটা পড়িয়া রহিয়াছে। আপনারাই আমার হইয়া সকলকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে আপনাদের নিকট সেই মর্ম্মে আদেশ করিয়াছেন।

এই বিপুল ঐশ্বর্য্য এবং অগণিত দাসদাসীর কথা বলিলেন, আমার ইহা হইতে কোন আবশ্যক নাই, আমি যাঁহার পদসেবিকা দাসী ছিলাম, তাঁহারই সঙ্গে যাইতেছি। কেন আমাকে এই মহৎ কার্য্যে বাধা প্রদান করিয়া অধর্ম্মের ভাগী হইতেছেন। এখন যাহাতে সত্বর আমাদের অন্তিম কার্য্য শেষ হয়, তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হউন।"*

অনেকক্ষণ বিলম্ব দেখিয়া পতিপ্রাণা সতী কুপিতা হইলেন। নিকটবর্ত্তী অনুচরদিগকে শীঘ্র প্রস্তুত হইবার জন্য আদেশ করিলেন।

হরসুন্দরীর নয়নে একবিন্দু অশ্রুও নাই; বিস্ফারিত নীল লোচন-যুগল রক্তবর্ণ, কেশজাল উচ্ছৃঙ্খল! মৃত পতির অনুগমনের জন্য যেন তাঁহার অত্যন্ত উৎসাহ উপস্থিত হইয়াছে।

ক্রমে ক্রমে আত্মীয় স্বজন গুরু পুরোহিত, একে একে সকলেই তাঁহাকে সহমরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সতীর হৃদয় টলিল না। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিলেন— "যদি এই ভারতবর্ষের সমস্ত রত্নরাজি, এবং সমস্ত পৃথিবীর অধী-

---

* "তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধ কোটীচ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
ব্যালগ্রাহী যথাব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
এব মুদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং তেনৈব সহমোদতে॥"

পরাশরসংহিতা চতুর্থোঽধ্যায়।

শ্বরী হই, তথাপি আমি এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিব না। আপনারা বিলম্ব করিয়া আমাকে আর কষ্ট দিবেন না। আমি যতক্ষণ ইঁহার সহিত এক চিতায় শয়ন না করিব, ততক্ষণ মধ্যে কিছুতেই আমার শান্তি হইবে না।

এই প্রকার নানাবিধ বাক্‌বিতণ্ডায় সেই দিন সেই রাত্রি গত হইল। কিন্তু কিছুতেই পতিপ্রাণা স্বামীর শবদেহ ত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য স্থানান্তরিতা হইলেন না।

পরদিন প্রভাতে গুরুদেব এবং অন্যান্য সকলে বলিলেন "মা! তুমিত চলিলে, কিন্তু তোমার স্বামীর আদেশ পালন হইল কৈ? একটী পোষ্যপুত্র রাখিয়া না গেলে তোমার শ্বশুর বংশের জলপিণ্ড লোপ হইয়া যাইবে। অতএব ইহার একটা প্রতিবিধান করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় করিতে পার।"

হরসুন্দরী বলিলেন—"আপনারা চেষ্টা করিয়া অবিলম্বে ছেলে আনয়ন করুন, সে পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করিতে স্বীকৃতা আছি।"

রাজা রামমোহনরায়ের প্ররোচনায় বৃটিশগবর্ণমেণ্ট, তখন সতী দাহ নিবারণ আইনের পাণ্ডুলিপি করিয়া "সিলেক্ট কমিটির" (Select Committee) মতের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎকালে প্রত্যেক জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উপর আদেশ ছিল যে, তাঁহার শাসন মধ্যে কোথাও সতীর ইচ্ছার বহির্ভূতে সতী দাহ না হয়, তৎ-প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। এই সংবাদ অচিরাৎ বরিশালে পঁহুছিলে তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব, পুলিশসাহেব এবং সরবরাকার সাহেব ক্ষণাৎ কীর্ত্তিপাশা আগমন করিবার জন্য রওনা হইলেন। অন্যদিকে যাহাতে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা না হয়, তজ্জন্য তারিণী চৌধুরাণী এবং তাঁহার অমাত্যবর্গ বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই পক্ষ

হইতে নানা চেষ্টা করাতে নিকটবর্ত্তী স্থানে পোষ্যপুত্র পাওয়া গেল না।

এইরূপে ক্রমাগত ছয় দিবস গত হইল, মৃতদেহ গলিত হইয়া তাহাতে অসংখ্য ক্রমির উদ্ভব হইল। পতিপ্রাণা এই কয়েক দিন কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করেন নাই; কেবল সূর্য্যাস্তের অত্যল্প পূর্ব্বে মৃতদেহের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধৌত করিয়া সেই জল পান করিতেন।

বিপক্ষগণের নানা চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ৺ শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, ৺ কিশোরচন্দ্র মহলানবিশ, ৺ গৌরচন্দ্র কবিভূষণ, ৺ নীলচন্দ্র সেন প্রভৃতি আমার পিতামহদেবকে আনয়ন করিলেন।

সপ্তম দিবসের সূর্য্যোদয়ে যথাশাস্ত্রানুমোদিত পোষ্যপুত্র গৃহীত হইলে, দেবী হরসুন্দরী স্বীয় কণ্ঠ হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক এক মহামূল্য মুক্তার মালা পুত্রকে অর্পণ করিলেন। * পরে সেই পুত্রকে উল্লিখিত আত্মীয়গণের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক স্বামীসহগামিনী হইতে প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে যথা সময়ে সাহেবগণ, এখানে পঁহুছিয়া দেখিলেন যে, সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় তেজস্বিনী এবং ভগবতী রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় রূপবতী কামিনী, মৃতদেহের সহিত হাস্যবদনে শ্মশানে যাইতেছেন। সাহেবগণ তাঁহার কিশোর বয়স এবং অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া যুগপৎ দুঃখিত এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন—"মা! তুমি কেন এই অপার ঐশ্বর্য্য এবং পুত্র পরিত্যাগ করিয়া অকালে তোমার এই সোনার দেহ ভস্মীভূত করিতে যাইতেছ? আমরা তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সন্তান প্রতিপালন করতঃ অন্যান্য ধর্ম্মোপার্জ্জন কর।"

* এই মুক্তার মালা আমাদের ঘরে এখনও আছে।

সাহেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী বলিলেন "সাহেব! আমাদের হিন্দু-রমণীগণের ইহা হইতে আর অধিক ধর্ম্ম নাই। যে জন্য পিতা মাতা আমাকে বিবাহ দিয়াছিলেন, আজ তাহাই প্রতিপালন করিতে যাইতেছি। আমাকে বাধা দিয়া আপনাদের কোন ফল নাই, বরং পাপসঞ্চয় হইবে।"

অন্যান্য সাহেবগণও অধিক বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু সতীর হৃদয় টলিল না। এদিকে চিতা প্রজ্জ্বলিত হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন "দেখ, তুমি যদি চিতা হইতে কোন প্রকার পলায়ন কর, তাহা হইলে তোমাকে আমি কঠোর শাস্তিবিধান করিব।"

দেবী হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনি সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার পলায়ন করা দূরে থাকুক, আমার কেশাগ্রও কম্পিত হইবে না। আপনারা এই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখুন।"

চিতা প্রস্তুত হইলে পর, শবদেহ তাহাতে স্থাপন করা হইল। দেবী হরসুন্দরী তখন স্নাতা হইয়া, অঙ্গের যাবতীয় আভরণ খুলিয়া একে একে সধবা রমণীগণকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। সকলের সহিত হাস্যমুখে আলাপ করিয়া প্রত্যেকের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। শ্মশানে তখন সহস্রাধিক স্ত্রীপুরুষ, বালক বালিকার সমাগম হইয়াছিল। এই বিষমজনমর্দ্দ, "নির্ব্বাত নিষ্কম্প-ইব" কাহারও মুখে একটি কথা নাই, সকলেই নিস্তব্ধভাবে, সেই স্বর্গীয়া দেবীর পানে চাহিয়া রহিলেন।

যখন সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ শেষ হইল, তখন ৺ কিশোরচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয় বলিলেন "মা! আমার আর একটি কথা আছে, তুমিত অন্তঃস্বত্বা হইতেও পার, তবে স্বীয় জীবনের সহিত আর একটী ভ্রূণের জীবন কেন নাশ করিতেছ?

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হরসুন্দরীর বিশাল লোচন যুগল হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "পুষ্পি!" পুষ্পী দাসী সেই স্থানেই ছিল, কাঁদিতে কাঁদিতে নিকটে আসিলে, তিনি বলিলেন। "আমি কোন তারিখে ঋতুস্নান করিয়াছি, তুই বল।"

পুষ্পী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, যে দিন কালীকুমার বাবুর মৃত্যু হইয়াছে, তাহার তিন চারি দিন পূর্ব্বে হরসুন্দরী ঋতু স্নান করিয়াছিলেন।

পুষ্পীর কথা শেষ হইলে, তিনি বলিলেন, "এখনও আমাকে বিরত করিতে কেন বৃথা চেষ্টা করিতেছেন।"

এমন সময় আমার পিতামহকে সহ তাঁহার পিতৃস্বসা শ্রীমতী তথায় উপস্থিত হইয়া, পুত্রকে কাঁদিতে কাঁদিতে মাতৃ-ক্রোড়ে প্রদান করিলেন। দেবী হরসুন্দরী পুত্রকে শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তুমি যে বংশে আসিয়াছ আশীর্ব্বাদ করি যেন পিতা পিতামহাদির ন্যায় অক্ষয় কীর্ত্তিবান এবং ধার্ম্মিক হও।"

পরে ননদিনীর দিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "বোন! আমার রাজকুমারকে তোমার করে অর্পণ করিলাম। দেখিও এ বালক মাতৃহীন হইয়াছে বলিয়া, যেন কখনও জানিতে না পারে।"

তারপর গুরুজনদিগকে প্রণাম, সমবয়স্কাদিগের সহিত সাদর সম্ভাষণ এবং ন্যূনবয়স্কাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি হাস্যমুখে চিতায় স্বামীর বাম পার্শ্বে শয়ন করিলেন।

শ্মশানবন্ধুগণ তখন তাঁহাকে স্বামীর সহিত বন্ধন করিতে চাহিলেন। তিনি হস্ত দ্বারা নিষেধ করিয়া, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

অচিরাৎ অগ্নি প্রদত্ত হইল। ধূপ, গুগ্‌গুল, অগুরু, ঘৃত প্রভৃতির সহিত মিশিয়া, চন্দন কাষ্ঠোপরি অগ্নিদেব ভীষণ প্রজ্জ্বলিত হইলেন। অগ্নি মধ্যে সতীসীমন্তিনীর পূত শরীর যেন সাক্ষাৎ সতীর ন্যায় দৃষ্ট হইল। তাঁহার একটী কেশাগ্রও কম্পিত হইল না। যে ভাবে স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই তাঁহার সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনির গম্ভীর রবের সহিত সেই পুণ্যময় দেহ দুইটি অচিরাৎ ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। দুইটী মহা প্রাণ এক সঙ্গে সেই মহাত্মায় বিলীন হইল।

উপস্থিত সাহেব মণ্ডলী ভাবিয়াছিলেন যে, অগ্নির উত্তাপে শরীর দহন করিতে আরম্ভ করিলে হরসুন্দরী দেবী অবশ্যই প্রাণ রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তাঁহারা যখন স্বচক্ষে দেখিলেন যে, তাঁহার মস্তকের কেশাগ্র পর্য্যন্তও কম্পিত হইল না, তখন তাঁহারা অশ্রুমোচন করিতে করিতে সতী হরসুন্দরীকে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিয়া ধীর পদে প্রস্থান করিলেন।

হরসুন্দরী দেবী যখন পতিসহগামিনী হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ মাত্র! চিতা নির্ব্বাপিত হইলে, সকলে সেই পূতভস্মরাশি অঙ্গে লেপন করিয়া, কতক কতক গৃহে লইয়া গেলেন। সন ১২৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে সতী শিরোমণি স্বামীসহ অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবার জন্য মহা প্রস্থান করিলেন।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৺ বাবু রাজকুমার সেন।

যে সময় স্বজনগণ প্রতিপালক, ধার্ম্মিক প্রবর, ৺ কালীকুমার বাবু এবং তদীয় পতিপ্রাণা পত্নী সতীকুল শিরোমণি দেবী হরসুন্দরী স্বর্গারোহণ করেন, তখন আমার পিতামহ দেব অত্যন্ত কিশোর বয়স্ক ছিলেন। বৈষয়িক কার্য্য রক্ষার ভার ৺ কালীকুমার বাবুর অনুমতি ক্রমে ৺ রামকিঙ্কর তর্কভূষণ এবং ৺ নন্দদুলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের প্রতি অর্পিত হয়। তৎকালে উল্লিখিত মহোদয়গণ এবং ৺ শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ৺ কিশোরচন্দ্র মহলানবিশ, ৺ গৌরচন্দ্র কবিভূষণ প্রভৃতি সকলেই এক মনে বৈষয়িক কার্য্যের উন্নতি বিধান করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাজকুমার বাবুকে নাবালক পাইয়া শত্রুরা নানা প্রকার বৈষয়িক অনিষ্ট করিতে লাগিল। নানা প্রকার বৃথা মোকদ্দমাদি দ্বারা যাহাতে এই পক্ষ নির্য্যাতন হয়, তাহার অশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। শুনিয়াছি যে, এই প্রকার শত্রুতায় উভয় পক্ষে এতদূর মনোবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল যে, একে অন্যের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করিতে পারিতেন না।

গুরু-ঠাকুরগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে, বৈষয়িক কোন প্রকার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং অন্যান্য মামলা মোকর্দ্দমায়, বহুতর অর্থ ব্যয় হইয়াছিল।

রণমতী গ্রাম নিবাসী ৺ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয় অতিশয় সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থ ছিলেন। তিনি একজন অতি প্রধান ভূম্যাধিকারী না হইলেও নগদ টাকা এবং জমা জমিতে বড় কম ছিলেন না। ঠাকুরদিগের কর্ত্তৃত্ব সময় অতি সামান্য কারণে ৺ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের সহিত আমাদের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। ৺ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়, অতিশয় বুদ্ধিমান এবং ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে নির্য্যাতন করিবার জন্য অনেক লোক খড়্গহস্ত ছিলেন। এই সুযোগ পাইয়া তন্মধ্য হইতে অনেকে আসিয়া আমাদের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক, যাহাতে পূর্ব্ব শত্রুতা শোধ হয়, সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঠাকুরগণ লেখা পড়ায় পণ্ডিত হইলে কি হয়, বৈষয়িক কার্য্যে ততদূর দক্ষ ছিলেন না; নানা লোকের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া একটা অতিশয় গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

যখন এই প্রকার বিবাদ চলিতে ছিল তখন, আমাদের এস্থানে একটা জনরব উঠিল যে, চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়, আমাদের কতেক প্রজাবাড়ী লুঠ করিয়া, তাহাদের গৃহ ভস্মাবশেষ করিয়াছেন। বাস্তবিক এই জনরব নিতান্ত অমূলক। শুদ্ধ, ঠাকুরদের, চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দেওয়ার জন্য, দুষ্টলোক কর্ত্তৃক এই প্রকার প্রবাদ উঠিয়াছিল।

এই জনপ্রবাদ এখানে প্রচারিত হইবামাত্র, কোন প্রকার তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া, কি প্রকার এই অপমানের প্রতিশোধ দেওয়া হইবে,

তজ্জন্য সকলে একত্র হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নানা জনে নানা উপায় উদ্ভাবন করিলেন। কিন্তু কোনটাই কর্ত্তৃপক্ষের মনোনীত হইল না। অবশেষে ঠাকুরদের মধ্যে একজন বলিলেন, যে, যখন চন্দ্রকিশোর সেন, আমাদের অপমান করিয়াছেন, তখন তাঁহার নিজের বাড়ী লুটপাট করিয়া, তাঁহার গৃহ ভস্মাবশেষ না করিলে, কিছুতেই ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে না। দুষ্টলোকগণ অমনিই এই অপমানকর কার্য্যে সম্মতি দান করিল। ৺ গৌরচন্দ্র কবিভূষণ, ৺ শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এবং আর একটুই একজন ভদ্রলোক, এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, যে, সত্যই যদি চন্দ্র সেনের পক্ষ হইতে তোমাদের (আমাদের) প্রজাবাড়ী লুণ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা, সেই প্রকার তাঁহার প্রজাবাড়ী লুণ্ঠন কর; এবং অন্য প্রকারে তাঁহার যাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে, সেই উপায় চিন্তা কর।

এই প্রস্তাব কেহই গ্রাহ্য করিলেন না; ঠাকুরগণ উন্মত্ত হইয়া, তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিষয়, কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইলেন।

অচিরাৎ বহু সংখ্যক অস্ত্রধারিলোক ১২৪২ সনের ২রা পৌষ তারিখ, চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের বাড়ী লুণ্ঠন করিতে অগ্রসর হইল।

চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয় যদিও পূর্ব্বে ইহার জনরব শুনিয়াছিলেন, তথাপি যে, ভদ্রলোকের পক্ষ হইতে কোন সম্মানিত ভদ্রলোকের বাড়ী লুণ্ঠিত হইবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। অকস্মাৎ জল প্রবাহবৎ, বহু সংখ্যক অস্ত্রধারি লোকের সমাগম দেখিয়া, স্ত্রীলোকদের কোন প্রকার অপমান না হয়, এই ভয়ে মূল্যবান দ্রব্যাদিসহ তাঁহাদের

স্থানান্তরে প্রেরণ করতঃ কতিপয় অস্ত্রধারি লোকসহ, আক্রমণকারীদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অসংখ্য লোকের সহিত, অল্প সংখ্যক লোকের সম্মুখ সংগ্রাম কতক্ষণ? অচিরাৎ তাহারা চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিলে, আক্রমণকারিগণ পঙ্গপালের ন্যায় সমস্ত বাড়ী ছাইয়া ফেলিল। লুঠপাট করতঃ জয়ধ্বনি করিয়া উচ্ছৃঙ্খল লোক প্রবাহ ফিরিয়া গেল।

শুনিয়াছি, যখন চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের নিজের গৃহ মধ্যে লুণ্ঠন করিতে লোক প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তিনি অথবা তাঁহার পক্ষের লোকেরা ২।৩টী এপক্ষীয় লোক শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছিল।

এই ঘটনা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইবামাত্র, দেশীয় যাবতীয় লোক ঠাকুরদের এই জঘন্য অত্যাচারের প্রতিশোধ দেওয়ার জন্য খড়্গ হস্ত হইল। এদিকে মোকদ্দমা স্থাপিত হইলে, পুলীশকর্ম্মচারীতে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইল। ঠাকুরগণ, এবং অন্যান্য আসামীগণ পলায়ন করিলেন।

এই ঘটনার সময় আমার পিতামহ দেবের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র। পুলীশকর্ম্মচারী তাঁহার নিকট এই ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যথার্থ বিষয় বর্ণনা করিলেন। পুলীশকর্ম্মচারী এবং অন্যান্য সকলে, এই সত্য কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

এই ঘটনা যখন ঘটিয়াছিল, তখন ৺ তারিণী চৌধুরাণী জীবিতা ছিলেন। তৎক্ষণাৎ এই সুযোগ অবলম্বনে, যাহাতে এই পক্ষ নির্য্যাতন হইতে পারে, তজ্জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরগণ অন্যান্য আসামীসহ অচিরাৎ ধৃত হইয়া বরিশালে

প্রেরিত হইলেন। তথায় বিচারে, ঠাকুরদের পাঁচ বৎসর কারাবাস, এবং অন্যান্য অপরাধিগণের অপরাধানুসারে দণ্ড বিধান হইল।

উঁহাগণ কারাবাসে প্রেরিত হইলে, বৈষয়িক কার্য্য বিশৃঙ্খলভাবে চলিতে লাগিল। তারিণী চৌধুরাণীর পক্ষ হইতে সদর মফঃস্বলে নানাপ্রকার উৎপাত এবং দৌরাত্ম্য হইতে লাগিল। ঠাকুরগণ কারাগারে থাকিয়া বৈষয়িক কার্য্য করিতেন বটে, কিন্তু অন্যান্য কার্য্যের ভার, ৺ গৌরচন্দ্র কবিভূষণ, ৺ নীলচন্দ্র সেন, ৺ কিশোর-চন্দ্র সেন, ৺ শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণকর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইত।

সন ১২৪৪ সালে ভদ্রাসন লইয়া অতিশয় বিবাদ উপস্থিত হইয়া বণ্টনের মোকদ্দমা দায়ের হইলে, বরিশাল হইতে ৺ নরহরি শিরোমণি পণ্ডিত সদরওয়ালা (Sub-Judge) স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বাড়ী অংশানুসারে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। উভয় পক্ষ হইতে বলা হইল যে, এক পক্ষ অন্য বাড়ী স্থানান্তরিত না হইলে কিছুতেই বিবাদের অবসান হইবার সম্ভব নাই। তখন স্থির হইল যে, ৺ তারিণী চৌধু-রাণীর পুত্র, ৺ চন্দ্রকুমার সেন মজুমদার মহাশয় এ পক্ষ হইতে দালান এবং অন্যান্য স্থানের মূল্য বাবদ ৪৩৫০ টাকা নগদ লইয়া অন্য বাড়ী গমন করিবেন। এইরূপ লিপি স্থির হইলে নাজিরপুর জমিদারির সদর খাজনার দায় ৺ তারিণী চৌধুরাণীর বসতি দালান নীলাম হইলে এ পক্ষ হইতে হরচন্দ্র দাস নামে মং ৮২৫ টাকা মূল্যে খরিদ করা হয়। এই খরিদ হইলে পুনরায় অত্যন্ত বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে উক্ত পণ্ডিত মহাশয় সরে জমিনে পঁহুছিয়া স্থির করিলেন যে, পূর্ব্ব-কথিত ৪৩৫০ মং টাকা হইতে ৮২৫ টাকা কাটাইয়া দিয়া ম ৩৫২৫ টাকা নগদ গ্রহণপূর্ব্বক ১২৪৫ সালে ২০শে অগ্রহায়ণ পৃথক বাড়ীতে

ভদ্রাসন স্থাপন করিলেন।* এই হইতেই বড়হিস্সা, এবং ছোটহিস্সা নামে উভয় বাড়ী অভিহিত হইল।

সন ১২৪৭ সালে রাজকুমার বাবু স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করিয়া অসাধারণ দক্ষতা এবং পরিশ্রমের সহিত বৈষয়িক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব যে সমস্ত বন্দোবস্ত অসম্পূর্ণ রাখিয়া, লোকলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনেকগুলি তিনি স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া বার্ষিক আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

কার্য্যভার হস্তে গ্রহণ করিয়া, তিনি তিনটি থারিজা সম্পত্তি খরিদ করেন, এবং তাহার অব্যবহিত পরে ভদ্রাসনে অন্যান্য ইষ্টকালয় নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতৃপিতামহ কৃত, এক-তালাগুলির উপর কতিপয় দোতালা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, বহির্ব্বাটীতে একটী চক মিলাইয়া ছিলেন।

বড়হিস্সা এবং ছোটহিস্সা পৃথক হইলে আমার পিতামহদেব, নিজ বাড়ীতে এক দুর্গামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে মহামায়ার অর্চ্চনা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া অতিশয় কারুকার্য্য শোভিত ইষ্টকনির্ম্মিত সুন্দর একটী দুর্গামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া তদুৎ-সর্গোপলক্ষে বহুতর টাকা খরচ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে আমাদের বহির্ব্বাটীস্থ এক সামান্য গৃহে উভয় বাড়ীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পূজা হইত।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে সেলিমাবাদ পরগণার জমিদার ভূ-কৈলাশ নিবাসী স্বর্গীয় রাজা ৺ সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর মহারাজ-গঞ্জে আগমন করিলে, সেলিমাবাদ পরগণার যাবতীয় ভূম্যধিকারী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। আমার পিতামহদেবের

---

* নরহরি শিরোমণি পণ্ডিত-কৃত রোয় দাদ।
তাং ২৮শে শ্রাবণ ১২৪৪ সাল।

সহিত রাজা বাহাদুর আলাপ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। নানা কথাচ্ছলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, যে রাজকুমার বাবু বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পূর্ব্ব উছিগণ হইতে তাঁহার নাবালকী সময়ের নিকাশাদি লইয়াছেন কিনা। আমার পিতামহ দেব সে পর্য্যন্ত কাহারও নিকট হইতে এই প্রকার হিসাব লইয়া ছিলেন না। সুতরাং রাজার নিকট তাহা বলিলে, তিনি ভূতপূর্ব্ব উছি, এবং প্রধান অমাত্যগণের নিকট হইতে এই প্রকার কাগজ লইতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমার পিতামহ দেব বাড়ীতে পৌঁছিয়া, ঠাকুরদের এবং অন্যান্য অমাত্যগণের নিকট এই প্রকার কাগজ তলপ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং সে সমস্ত কাগজ দাখিল হইয়াছিল কিনা, তাহা জানিতে পারি নাই।

রাজকুমার বাবু অতিশয় সুন্দর পুরুষ না হইলেও তিনি একেবারে কুৎসিৎপদ বাচ্য ছিলেন না। তাঁহার শরীর এবং পেশী সমূহ অতিশয় দৃঢ় ছিল। মুখকান্তি গম্ভীর এবং তেজঃব্যঞ্জক, ললাট প্রশস্ত এবং ভ্রুদ্বয় ঈষৎ সঙ্কুচিত। চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল এবং বিস্ফারিত, মধ্যস্থ তারা দুইটী গভীর নীল। অত্যুজ্জ্বল শ্যামকান্তি এবং শরীরের আয়তন দীর্ঘ ছিল।

তিনি, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহাদির ন্যায় প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে ৺ সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির মধ্যে বসিয়া নিত্য পূজা নির্ব্বাহ করিতেন। তারপর বৈষয়িক কার্য্য শেষ করিয়া আহারান্তে অল্পকাল নিদ্রা যাইতেন। সন্ধ্যার পর প্রত্যহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠান্তে বৈষ্ণবগণসহ ৺ হরিসঙ্কীর্ত্তন হইত। রাজকুমার বাবু ...জ গান করিতে পারিতেন না, কিন্তু পবিত্র হরিনামে মাতিয়া উঠিয়া স্বয়ং সেই বৈষ্ণব মণ্ডলীর সহিত নৃত্য করিতেন।

এই প্রকার সঙ্কীর্ত্তনে প্রত্যহ সোয়াসের হইতে সোয়ামণ পর্য্যন্ত বাতাসা বৈষ্ণব সেবায় খরচ হইত।

১২৫১ সালের বৈশাখ মাস হইতে তিনি "চৌদ্দমাদন মহোৎসবের" আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই মহোৎসব ব্যাপারে ভারতবর্ষস্থিত যাবতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং আখরার অধিকারিগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বৈশাখ মাস হইতে আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে এই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল।

ধার্য্য দিনের প্রায় একমাস পূর্ব্ব হইতে বৈষ্ণবমণ্ডলী সাধু সন্ন্যাসিগণ, এবং অন্যান্য আহূত লোকে কীর্ত্তিপাশা গ্রাম পরিপূর্ণ হইল। পিতামহ দেব, সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া উপযুক্ত বাসস্থান এবং খাদ্যাদি প্রদান করিয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে নিশীথ সময় পর্য্যন্ত হরিসঙ্কীর্ত্তনে সমস্ত গ্রাম মাতিয়া উঠিয়াছিল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে সেই হরিনাম স্রোতে শরীর ঢালিয়া দিয়া মহানন্দে সেই নামসুধা পানে উন্মত্ত হইয়াছিলেন।

ধার্য্য তারিখ আগত হইলে, বৈষ্ণব মণ্ডলীর সেবার জন্য আমাদের সিংহদ্বার হইতে বাজারের খাল পর্য্যন্ত যে রাস্তা বর্ত্তমান আছে, তাহার দুই পার্শ্বে চুল্লী খনন পূর্ব্বক পর্ব্বতাকার রাশি রাশি অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল।

এদিকে বৈষ্ণব মণ্ডলী আহারে প্রবৃত্ত হইবেন, এমন সময়ে নীলাকাশে অকস্মাৎ মেঘোদয় হইল। কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করিল। মৃদুমন্দ পবনের সহিত গম্ভীর বজ্রধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল।

অকস্মাৎ এই ভীষণ প্রাকৃতিক বিপ্লবের উপক্রম দেখিয়া, উপস্থিত

বৈষ্ণব মণ্ডলী এবং অন্যান্য সকলেই চিন্তিত হইলেন। গম্ভীর জীমূত গর্জ্জনের সহিত গম্ভীর হরিধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

আমার পিতামহদেব, অকস্মাৎ এই প্রকার বিপদের আগমনে অতিশয় ভীত হইলেন। তাঁহার বিশাল লোচনযুগল হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুপতন হইতে লাগিল। ন্যূনাধিক প্রায় দশ সহস্র বৈষ্ণব সন্তান, সাধু, সন্ন্যাসী প্রভৃতির সেবার অন্নব্যঞ্জন নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে, রাজকুমারবাবু তখন গলদশ্রুলোচনে ৺ সিদ্ধেশ্বরীমাতার সন্মুখে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে মেঘমালা ক্রমশঃই ঘনীভূত হইয়া প্রবাহমানবায়ু ক্রমশঃ খরতর হইতে লাগিল। এবং তৎসহ অল্প অল্প বৃষ্টিবিন্দু পতিত হইতে লাগিল।

আমার পিতামহদেব সংজ্ঞাশূন্য প্রায় হইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত শরীর কর্দ্দমাক্ত, কেশজাল উচ্ছৃঙ্খল, ললাটের শিরা স্ফীত, এবং বিশাল লোচনযুগল রক্তবর্ণ। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে করিতে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে, রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিলেন।

এই প্রকার কতিপয় দণ্ড অতিবাহিত হইলে অকস্মাৎ সেই বিপুল মেঘরাশি, ধীরে চতুর্দ্দিকে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আকাশ মেঘশূন্য হইল। সূর্য্যদেব মেঘান্তরাল হইতে বাহির হইয়া উপস্থিত বৈষ্ণবমণ্ডলীকে, যেন আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

আকাশ মেঘ নির্ম্মুক্ত হইলে, উপস্থিত বৈষ্ণবমণ্ডলী এবং অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসীর মধ্যে তুমুল জয়ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। সেই হর্ষপূর্ণ ধ্বনি দূরদূরান্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

তখন সকলে রাজকুমার বাবুকে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিয়া, তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন।

জগদীশ্বরের কৃপায় সেই লোকসমূহ নিরাপদে আহার করিয়া স্ব স্ব বাসভবনে প্রস্থান করিল।

শুনিয়াছি যে, এই বৃহৎ কার্য্যোপলক্ষে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ২৬ টাকা হারে দান করা হয়, সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় লক্ষাধিক টাকার উপরে ব্যয় হইয়াছিল। এই কার্য্য এরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ হইল যে, নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবমণ্ডলী, অভ্যাগত সাধু, সন্ন্যাসী এবং দেশ বিদেশস্থ যাবতীয় লোক একবাক্যে রাজকুমার বাবুর যশঃকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

আমার পিতামহ দেবের শরীর বলিষ্ঠ হইলেও একটা কঠিন ব্যাধিতে তিনি সর্ব্বদা বড়ই কষ্ট পাইতেন। মধ্যে মধ্যে নাভি হইতে একটা বেদনা উপস্থিত হইয়া, ক্রমশঃ বক্ষঃ পার্শ্ব প্রভৃতি আক্রমণ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইতেন। তিন চারি ঘণ্টা এই প্রকার ক্রমাগত মূর্চ্ছা হইলে, কতকগুলি বমন হইত; তারপর ক্রমাগত সুস্থ হইতেন। বহু চিকিৎসায় এই রোগ সময় সময় যাপ্য হইত মাত্র।

উল্লিখিত মহোৎসব ব্যাপার উপলক্ষে রাজকুমার বাবুর অতিশয় শারীরিক পরিশ্রম এবং স্নান আহার সম্বন্ধে অনিয়ম করায়, এই ব্যাধি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে আক্রমণ করিল। আমার পিতামহঠাকুর রোগ যাতনায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন।

নানা চিকিৎসায় কিছু প্রতিকার হইয়াছিল; কিন্তু পূর্ব্ববৎ যাপ্য হইয়াছিল না। মধ্যে মধ্যে একটু প্রতিকার হইলে কয়েক দিন সুস্থ থাকিতেন, আবার রোগ দ্বিগুণ তেজে আক্রমণ করিত।

রাজকুমার বাবুর বয়ঃক্রম যখন পঞ্চদশ কি ষোড়শ বৎসর, তখন সিদ্ধকারি নিবাসী ৺ কালাচাঁদ সেন মহাশয়ের কন্যার সঙ্গে তাঁহার শুভ পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। আমার পিতামহীদেবীর নাম ব্রহ্মময়ী। তিনি তাদৃশতীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না রমণী ছিলেন না; কিন্তু তাঁহার সরলতা এবং পরদুঃখকাতরতা এখনও এদেশে প্রসিদ্ধ আছে।

একদা ছোটহিস্যা হইতে যাত্রাগানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া, অপরাহ্ন সময় রাজকুমার বাবুর পূর্ব্বোক্ত পীড়া উপস্থিত হইয়াছিল। অন্য দিন যে প্রকার বেদনা উপস্থিত হইত, সেই দিনও সেই প্রকার বেদনা উপস্থিত হইয়া মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। যে কয়েকজন পরিচারক তাঁহার সেবা করিত, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহার সুস্থতা দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রিতে পরিণতা হইল। এদিকে রাজকুমার বাবুর ব্যারাম ক্রমশঃ সাংঘাতিক দেখিয়া সকলে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক চেষ্টায়ও তাঁহার সেই মূর্চ্ছার অপনোদন হইল না। রাত্রি প্রহরেক অতীত হইবার পূর্ব্বে, আশ্রিতজনকে চিরদুঃখে নিক্ষেপ করিয়া সন ১২৫২ সালের ২রা আশ্বিন তারিখে কৃষ্ণাদ্বিতীয়া তিথিতে ২৪ বৎসর বয়সে, আমার পিতামহদেব স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

রাজকুমার বাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে এ প্রদেশে অনেক জনরব শুনিতে পাওয়া যায়। আমি আমার বিশ্বস্ত পুরাতন কর্ম্মচারী, এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণের নিকট যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে এই জনরব সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কিন্তু আমার মাতৃদেবী, আমার পিতামহদেবের মৃত্যু সম্বন্ধে একদিন আমার নিকট যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় যে, তিনি এই জনরব সম্বন্ধে অনেকটা বিশ্বাস করিতেন। আমার জননী আরও বলিয়াছেন যে,

আমার পিতৃদেব সেই জনরব প্রকৃত ঘটনা বলিয়াই জানিতেন। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও এই জনরব এইদেশে এতদূর প্রচলিত যে, তাহা যে অমূলক, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইবেন না। এখনও ভট্ট কবিগণের মুখে সেই সম্বন্ধে একটি কবিতা শ্রুত হওয়া যায়। আমিও সেই কবিতাটীর কতকাংশ জানিতাম। আমাদের পরম হিতৈষী বান্ধব প্রবর, স্বনাম ধন্য, স্বর্গগত মহাত্মা রেলি সাহেব আমার পিতামহদেবের মৃত্যু সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এবং আমি মাতৃ প্রমুখাৎ যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি তাহা পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণ করিবার জন্য অবিকল লিপিবদ্ধ করিলাম।

মহারাজগঞ্জ হইতে রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিছুদিন পরেই রাজকুমারবাবু শুনিতে পাইলেন যে, বরিশালস্থ প্রধান কার্য্যকারক, কতকগুলি টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। রাজার বাক্য তখন তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অপহৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিবার জন্য অন্য আর একজন প্রধান কার্য্যকারকে তথায় প্রেরণ করিলেন। অচিরাৎ সেই ব্যক্তি তাঁহার নিকট আনীত হইলে, তিনি সেই কর্ম্মচারীর প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। অনতিবিলম্বে অপহৃত সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া রাজকুমারবাবু অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের সহিত, তাঁহার নাবালগি সময়ের হিসাব ও নিকাশ তলপ দিয়াছিলেন।

মা, বলিয়াছেন যে, এই নিকাশ তলপ দেওয়াই তাঁহার মৃত্যুর কারণ।

ছোট হিস্যা হইতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া, বাটী আসিবামাত্রই এক গ্লাস সরবৎ পান করিয়াছিলেন। সেই পানীয় দ্রব্যের সঙ্গেই নাকি

শত্রুগণ কালকূট-মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল। অত্যল্প কাল মধ্যে বিষের জ্বালায় জর্জ্জরীভূত হইয়া, অত্যন্ত কাতর ভাবে শয্যার উপর ছটফট করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে দুষ্টলোক কর্ত্তৃক প্রচারিত হইল যে, রাজকুমার বাবু পূর্ব্বজাত মূর্চ্ছা ব্যাধিতে ছটফট করিতেছেন। অন্য চিকিৎসক আনা দূরে থাকুক, আমাদের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ধন্বন্তরিকল্প স্বর্গীয় প্যারীমোহন দাস মহাশয় পর্য্যন্ত এ সংবাদ পাইয়াছিলেন না। আমার পিতৃদেবকে কোলে করিয়া আমার পিতামহী দেবী তখন অন্য এক প্রকোষ্ঠে নিদ্রা যাইতে ছিলেন ; তিনি গোলমাল শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বামীর শয্যা গৃহ পানে যাইতেছেন, এমন সময়ে জনৈকলোক, তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল "তোমার কপাল পুড়িয়াছে। আর কেন বৃথা ও দিকে যাইয়া আত্মঘাতিনী হইবে।"

আমার পিতামহী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অত্যন্ত ব্যাকুলিতা হইয়া, অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু আরও কয়েক জন লোক আসিয়া তাঁহাকে, আমার পিতৃদেবকে সহ অন্য এক প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল।

আমার পিতামহদেবকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য শ্মশানে লইয়া গেলে পরও নাকি তিনি জীবিত ছিলেন। শুনিয়াছি যে, দুর্ব্বৃত্তগণ তখন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তাঁহার শরীর খণ্ড খণ্ড পূর্ব্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

এ দিকে মাল খানার মধ্যে যে সমস্ত নগদ টাকা, স্বর্ণরৌপ্যের দ্রব্যাদি ছিল, তাহা লুঠ হইতে আরম্ভ হইল। মা বলিয়াছেন, যে, যদি, রায় সাহেব না আসিতেন, তাহা হইলে, অবশিষ্ট সম্পত্তির সহিত আমার পিতৃদেব ও নিহত হইতেন।

এই ত জনরব। কিন্তু আমার পিতামহ দেবের মৃত্যুর পর যে

আমাদের ন্যস্ত নগদ টাকা, স্বর্ণরৌপের দ্রব্যাদি, এবং দলীলপত্রাদি অপহৃত হইয়াছিল, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু নিকাশ তলপ দেওয়া এবং অপহৃত সম্পত্তি আদায় করার পর যে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া এই প্রকার মিথ্যা অপবাদ রটনা হইয়াছে।

যখন আমার পিতামহ দেবের মৃত্যু হয়, তখন আমার পিতামহী অষ্টম মাসের গর্ব্ভবতী ছিলেন। আমার পিতৃদেবের বয়স তখন ছয় বৎসর মাত্র। সেই গর্ব্ভে একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়া সুতিকাগারেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

রাজকুমার বাবুর মৃত্যুর পর, এই সম্বন্ধে একটা মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়, কিন্তু আমার পিতামহী, স্বামীর মৃত্যু সম্বন্ধে দাবি রাখিলেন না বলিয়া মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়াছিল।

রাজকুমার বাবুর মৃত্যুর ঠিক এক বৎসর মধ্যে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে আমার পিতামহী উছিস্বরূপ, আমাদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন।





সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্বর্গীয় বাবু প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী।

আমার পিতৃদেব ১২৪৬ সালের ২১ কার্ত্তিক মঙ্গলবার কৃষ্ণাচতুর্থী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি তাঁহার জন্মোপলক্ষে অতিশয় সমারোহ হইয়াছিল। জন্মদিন হইতে অশৌচান্ত পর্য্যন্ত যত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন, সকলেই প্রচুর পরিমাণে অর্থ এবং আহার্য্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এ দিকে, তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সহিত, অতি অল্প বয়স হইতেই তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধির বিকাশ হইতে লাগিল। যখন সামান্য দুই একটী বাক্য অস্ফুট উচ্চারিত হইত, তখন হইতেই তিনি যে কথা, যে সংস্কৃত কবিতা একবার শুনিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা তাঁহার কণ্ঠস্থ হইত। নাচিয়া নাচিয়া সেই আধ আধ-বাক্য সুধাবর্ষণ করিতেন। জানি না, রাজকুমার বাবুর মত ধার্ম্মিক মহাপুরুষের পবিত্র জীবনী কেন অকালে ফুরাইল। অল্প বয়সে যে, বিশাল কার্য্যভার তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল এবং কুচক্রীদের কুটিল চক্রান্তে তিনি যে পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত ছিলেন, তাহাতে আমার পিতৃদেবই তাঁহার এক মাত্র নয়নানন্দ স্বরূপ ছিলেন। ভগবানের কি গূঢ় মঙ্গল ইচ্ছা সাধন

হইবার জন্য যে আমার পিতৃদেব অকালে পিতৃ মাতৃ হীন হইয়া ছিলেন, তাহা কেমন করিয়া বুঝিব ? আজন্ম সম্পদের কোলে পালিত হইয়া, আমার পিতৃদেব যে কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যখন রাজকুমার বাবু স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তখন পিতৃদেবের বয়স ছয় বৎসর মাত্র। এই কিশোর বয়সে সাক্ষাৎ ঈশ্বরতুল্য পিতৃদেবকে হারাইয়া প্রত্যক্ষ স্নেহরূপিণী জননীর দিকে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের তাহাও সহ্য হইল না। আমার পিতৃদেবকে অকুল সাগরে ভাসাইয়া তাঁহার জননী দেবী এক বৎসরের মধ্যেই জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

আমার পিতৃদেব অতি শৈশবকাল হইতে শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র ভদ্র মহাশয় দ্বারা পালিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বদা ভদ্র মহাশয় তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া রক্ষা করিতেন। পিতামহ ঠাকুরের মৃত্যুরপর হইতেই ভদ্র মহাশয় এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার পিতৃঠাকুরকে নয়নান্তরাল করেন নাই। অধিক কি বলিব, যদি তিনি সেই সময় হইতে আমার পিতৃদেবকে সেই প্রকার রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে আজ আমাদের বংশাবলীর নাম পর্য্যন্ত অনন্তে অন্তর্হিত হইত। আজ যদি সিন্ধুগর্ত্তস্থ অনন্ত রত্নরাজি, আসমুদ্র ক্ষিতিতল এবং জগৎ পিতাকে স্তবে সন্তুষ্ট দ্বারা নির্ব্বাণমুক্তি, তাঁহাকে অর্পণ করিয়াও যদি বলি যে, 'আজ আমার পিতৃদেব আপনার ঋণ হইতে মুক্ত হইলেন,' তাহা হইলেও সেই ঋণ মুক্ত হওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এই মহাত্মা এখনও জীবিত আছেন। আমার পিতৃদেবের নাম, তাঁহার নিকট উচ্চারিত হইলে, নয়ন জলে তাঁহার বক্ষ ভিজিয়া যায়। আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, যে সেই অশ্রু প্রবাহ তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তম

প্রকোষ্ঠ হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্ব স্নেহ স্মৃতির পরিচয় দিতেছে। অদ্যাপি যদি আমাদের কি আমাদের সন্তান সন্ততিগণের কোন প্রকার সামান্য পীড়া ও উপস্থিত হয়, ভদ্র মহাশয় তখন অত্যন্ত কাতর হইয়া, কিসে আমরা সুস্থ হইব, সেই চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহার বয়স এখন প্রায় ৭০ বৎসর, কিন্তু তাঁহার শরীর এখনও বলিষ্ঠ এবং পেশী সকল দৃঢ়। চক্ষের জ্যোতিঃ পূর্ব্বপেক্ষা হীন হইয়াছে, তথাপি অসাধারণ পরিশ্রম সহকারে স্বকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

আমার পিতামহী দেবীর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, জেলার মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের আদেশানুসারে বরিশাল হইতে আমাদের ঐকান্তিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, স্বর্গগত মহাত্মা রেলী সাহেব তৎক্ষণাৎ কীর্ত্তিপাশা আগমন করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি যে, আমার পিতামহীর মৃত্যু হইবামাত্র কতকগুলি নগদ টাকা এবং স্বর্ণ রৌপ্যের জিনিস শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল।

রেলী সাহেব তখন বরিশালে ডিপুটি মেজিষ্ট্রেট এবং ডিঃ কালেক্টর ছিলেন। তিনি আসিয়া অস্থাবর সম্পত্তি যাহা ছিল, তাহার একটী তালিকা করিয়া অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি, কোর্ট অব ওয়ার্ডসের (Court of wards) অধীনে আনিবার হুকুম প্রদান পূর্ব্বক, আমার পিতৃদেবকেসহ একেবারে বরিশালে চলিয়া আসেন।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেকবার উক্ত মহাত্মা কি প্রকারে কি অবস্থায় আমার পিতৃদেবকে পাইয়াছিলেন এবং কিভাবে তাঁহাকে সঙ্গে নিয়াছিলেন প্রভৃতি তাঁহার বাল্য জীবনীর যাবতীয় ঘটনা কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন। তারপর আমি আমার পিতৃদেবের জীবনী সঙ্কলন করিব বলিয়া সাহেব বাহাদুরের নিকট পত্র লিখায়, তিনি একখানি সুদীর্ঘ ইংরেজী পত্রে আমার পিতামহের মৃত্যু হইতে আমার পিতৃ-

দেবের বয়ঃপ্রাপ্ত পর্য্যন্ত কালের অনেক প্রধান প্রধান ঘটনা লিখিয়া দিয়াছিলেন।

আমার পিতামহ ঠাকুরের মৃত্যু সম্বন্ধে যে দেশ-প্রচলিত জনরব আছে, সাহেব বাহাদুরের পত্র মধ্যে সেই কথাই অধিক, তারপর সংক্ষেপে অন্যান্য বিষয় বিবৃত আছে। আমি সেই পত্রের অবিকল বাঙ্গালানুবাদ পাঠক বর্গের কৌতূহল নিবারণ করিবার জন্য লিখিলাম। শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র ভদ্র মহাশয়, পিতৃদেবের বাল্যজীবনী সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত সাহেব মহোদয়ের লিপির কোন প্রকার অনৈক্য নাই। শ্রীযুক্ত নয়নচন্দ্র সেন মহাশয় ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে অনেক জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা আমার পিতৃদেবের সঙ্গে ছিলেন না; তথাপি তাঁহাদের কথার সহিত সাহেব মহোদয়ের কথার সঙ্গে অনেক ঐক্য আছে।

(সাহেব বাহাদুরের পত্রের বঙ্গানুবাদ)

"আমি যখন তোমাদের বাড়ী পৌছিয়াছিলাম, তখন বেলা দশটার অধিক হয় নাই। সিংহদ্বার দিয়া পুর-প্রবেশ করিলে পর প্রথমতঃ কয়েকজন কর্ম্মচারী (তাঁহাদের নাম আমার স্মরণ নাই) আমাকে সেলাম করিলেন। আমি তোমার পিতামহের বৈঠকখানায় (পূর্ব্বে এই স্থানে কাছারী হইত) পৌছিয়া দেখিলাম যে, ঘরের বারান্দায় অনেকগুলি খট্টার উপর সামান্য মাদুরের বিছানা রহিয়াছে। ঘরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কাষ্ঠ নির্ম্মিত চাবি-বন্দ সিন্দুক রহিয়াছে। আমি চাবি চাহিলে পর * * * * আমাকে চাবি দিলেন না। তারপর কামার ডাকিয়া তালা ভাঙ্গিয়া আমি সর্ব্ব সমক্ষে সেই সিন্দুক

উদ্ঘাটন পূর্ব্বক নগদ টাকা যাহা ছিল, তাহা গণিয়া তোড়া বন্ধন পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের সিলমোহর করিয়া আমার বিশ্বস্ত পেস্কারের নিকট দিলাম। তোমার পিতাকে সে পর্য্যন্ত আমি দেখিতে পাই নাই। আমি তোমার পিতাকে দেখিতে চাহিলে, অনতিবিলম্বে রাজু কোলে করিয়া তাহাকে আমার নিকট আনিল। তোমার পিতার বাহ্য চেহারা দর্শনে আমার যুগপৎ ক্রোধ এবং কষ্ট উপস্থিত হইল। তাহার সমস্ত শরীর অতিশয় শীর্ণ, পেট উঁচু এবং তাহাতে কাল কাল বড় শিরাসমূহ স্ফীত। অঙ্গের বর্ণ কালিমা প্রাপ্ত হইয়াছে, অঙ্গে হাত দিয়া দেখিলাম যে শরীর উষ্ণ।"

"তাঁহার শরীরের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত কর্ম্মচারিগণকে আমি অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিলাম। প্রকৃত পক্ষে তোমার পিতার তখন যে প্রকার অবস্থা ছিল, তাহাতে যে, সে অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তাহাতে আর কোন সন্দেহ ছিল না। প্লীহা, যকৃৎ, এবং তৎসহ অল্প অল্প জ্বর, মুখে রক্তহীনতা প্রভৃতি জীবননাশের অনেকগুলি দুর্লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল। আমি তারপর তোমাদের উত্তরের দ্বিতল কক্ষে গমন করিয়া দেখিলাম যে, কক্ষের প্রান্তভাগে একখানি মূল্যবান পালঙ্গোপরি সুন্দর শয্যা বিতান রহিয়াছে। ভাবিলাম বুঝি তোমার পিতা ঐ শয্যায় শয়ন করিতেন। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, ঐ শয্যায় তোমাদের ইষ্টদেবতা ঠাকুরগণ শয়ন করিতেন। এই কথা জানিতে পারিয়া আমার অন্তঃকরণে বড়ই রাগ উপস্থিত হইল। তখন যে জনরব শুনিয়াছিলাম, তাহার সত্যতা অনুভব করিলাম। মনে তখন প্রতীতি জন্মিল যে, নিশ্চয়ই তোমার পিতাকে নিহত করিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছে, নচেৎ কেন তাহাকে নীচের তলায় অন্ধকূপের ভিতর রাখিয়া, নিজেরা মহা স্বচ্ছন্দে

দোতালায় বাস করিবে? আমি তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে সেই সমস্ত শয্যা নিম্নে নিক্ষেপ করিলাম।"

"আমার কোপ দর্শনে, * * * * অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল।"

অন্যান্য কার্য্য সমাধা করিয়া, তোমার পিতাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি আমার সঙ্গে যাইবে?"

তোমার পিতা আমার আকৃতি এবং রাগ দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। আমার কথার উত্তর প্রদান করা দূরে থাকুক, আমার দিকে ভয়ে বিহ্বল নেত্রে চাহিতে লাগিল। রাজু, তোমার পিতাকে আমার সঙ্গে কথা বলিতে জেদ করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তারপর আমি তাহাকে খেলা দিতে আরম্ভ করায় সে আমার সহিত অল্প অল্প কথা বলিতে আরম্ভ করিল। আমার নৌকায় আমার ছেলেদের খেলিবার কয়েকটা পুতুল ছিল; আমি তাহা আনাইয়া তোমার পিতাকে দিলাম। সে মহা হর্ষান্বিত হইয়া, ধীরে ধীরে আমার ক্রোড়ে আসিল। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এখন, আমার সহিত যাইতে প্রস্তুত কিনা। তোমার পিতা প্রফুল্লবদনে স্বীকৃত হইল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যে, তাহার কাহাকে কাহাকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করে। তোমার পিতা রাজুকে কিছুতেই ছাড়িল না। রাজু, তোমার একজন জ্ঞাতি, তোমার পিতার মাতামহ এই কয়েক জন মাত্র সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ তোমার পিতাকে আমার নৌকায় লইয়া আসিলাম।"

"নৌকায় আসিবার সময় গ্রামের অনেক স্ত্রীলোক, তোমার পিতাকে দেখিতে আসিয়াছিল। তাহাদের সকলের চক্ষেই জলধারা এবং মুখে বিষাদের চিহ্ন।"

"নৌকা খুলিবার সময় দেখিতে পাইলাম যে, তীর হইতে কতকগুলি ঢাল সরকিওয়ালা লোক, আমার নৌকা আক্রমণ করিতে আসিতেছে। আমার সঙ্গে কয়েক জন কনেষ্টবল ছিল মাত্র। আমি একটা রিভলভার (Revolver) হাতে লইয়া নৌকার ছাদের উপর উঠিলাম। আমার হাতে বন্দুক দেখিয়া, ঢাল, সর্‌কিওয়ালার দল পিছে থাকিল। আমি তখন তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম যে, যদি তাহারা আমার নৌকা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, আমি নিশ্চয়ই গুলি করিয়া তাহাদের প্রাণ সংহার করিব।"

"নৌকা ধীরে ধীরে খুলিয়া দিল। কিন্তু অস্ত্রধারী লোক সমূহ অন্য এক ডিঙ্গিতে আমার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। আমি তখন অন্য লোক দ্বারা কল্‌ভিন্ সাহেবকে সংবাদ দিলাম। ইনি তখন বর্ত্তমান মহদিপুরের নিকট একটা নীলের কুঠিতে ছিলেন। তিনি এই সংবাদ প্রাপ্তমাত্র কয়েকটী বন্দুক ও কয়েকজন দ্বারবান্‌সহ আমার নৌকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ আমার অনুসরণকারী ডিঙ্গি লক্ষ্য করিয়া কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ করিলে, সেই সমস্ত লোক পলায়ন করিল।"

"আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম যে এই অস্ত্রধারী লোক * * * প্রেরিত। আমার নিকট হইতে তোমার পিতাকে লইয়া যাওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল।"

"আমার স্বর্গগত সহধর্ম্মিণী অতিশয় স্নেহপরায়ণা রমণী ছিলেন। তিনি তোমার পিতৃমাতৃহীন পিতাকে পাইয়া অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক লালন পালন করিতে লাগিলেন। আমার অন্যান্য পুত্র কন্যাদিগকে তিনি যে প্রকার স্নেহ ও যত্ন করিতেন, তোমার পিতাকে তদপেক্ষা ন্যূন আদর করিতেন না।"

"বর্ত্তমান যে দ্বিতল প্রকোষ্ঠে বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কাছারী করেন, তোমার পিতা রাজুর সহিত ঐ ঘরে বাস করিতেন। কোন শত্রু কর্ত্তৃক রাত্রিতে তোমার পিতার প্রাণ বিনষ্ট না হয় এই জন্য আমার অনুমতিক্রমে ৮ জন সঙ্গীনধারী কনেষ্টবল প্রহরীর কার্য্যে সর্ব্বদা দণ্ডায়মান থাকিত।"

"এই প্রকার ২।৩ বৎসর তোমার পিতা বরিশালস্থ গভর্ণমেণ্ট স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ঢাকায় গমন করিয়াছিল।"

সাহেবের পত্রের কতকাংশ মাত্র উল্লেখ করিলাম। তাঁহার সুদীর্ঘ লিপিতে আর যে সমস্ত বিষয় লিখিত আছে, তাহা সবিস্তার লিখিতে গেলে, কাহার কাহারও মনে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইবার সম্ভব, সুতরাং সেই বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম।

ষ্টেট যখন কোর্ট অব্‌ওয়ার্ডসের অধীনে নীত হইয়াছিল, তখন বাণিনাথ সেন সরবরাহকার ছিলেন। পিতৃদেব, তাঁহার পাঠের ব্যয়, এবং সঙ্গীয় লোক জনের খোরাকী ও মাহিয়ানা মাসে মাসে ট্রেজারি হইতে প্রাপ্ত হইতেন মাত্র। ইহা ব্যতীত, এক কপর্দ্দকও ম্যাজিষ্ট্রেটের বিনা হুকুমে প্রাপ্ত হইতেন না।

এদিকে ২।৩ বৎসর বরিশালে বিদ্যাভ্যাস করিয়া ঢাকায় গমন করিলেন। তথায় শাঁখারিবাজারে এক দ্বিতল গৃহে বাস করিতেন। অদ্যাপি সেই বাড়ী, "নাবালগ বাবুর বাড়ী" বলিয়া বিখ্যাত আছে।

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের সুযোগ্য হেড্ মাষ্টার স্বর্গীয় বাবু কৈলাস চন্দ্র ঘোষ বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহাকে পাঠাভ্যাস করাইতেন।

প্রত্যেক বৎসর পূজার সময় বাড়ী আসিতেন। কিন্তু বাড়ী হইতে প্রস্থান করিবার পর ৬।৭ বৎসর মধ্যে একবারও বাড়ী আসেন নাই। সর্ব্বদা তাঁহার নিজ মনে আশঙ্কা ছিল বলিয়াই হউক, অথবা

সাহেব বাহাদুরের অনভিপ্রায়-হেতুই হউক, একটু বয়োবৃদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত দেশে প্রত্যাগমন করেন নাই।

এ দিকে পূর্ব্ব সরবরাহকার অবসর হইলে তাঁহার স্থলে আর, ডবলিউ স্কট (R. W. Scot) নামক অন্য একজন সরবরাহকার নিযুক্ত হইয়া আমাদের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি ইজারাবন্দোবস্ত করিবার বিজ্ঞাপন প্রদান করিলেন। যত খারিজা (গভর্ণমেণ্ট হইতে যে সমস্ত বিত্ত ক্রয় করা হয়) সম্পত্তি বাসণ্ডা নিবাসী ৺শিবশঙ্কর মহলানবীশ সঙ্গে ১১ বৎসর মিয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত হইল। অপর সিকিমি (জমিদারগণের মধ্যে যে সমস্ত বিত্ত) মহল সমুদয় ৺চন্দ্রকুমার বাবু তিন বৎসর মিয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন।

আমাদের ঐকান্তিক হিতকারিগণ পিতৃদেবের বিদেশ গমনে এবং ষ্টেট কোর্ট অব্ ওয়ার্ডে নীত হওনে অত্যন্ত মনঃকষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সহায়হীন, সম্পদহীন, সুতরাং আমাদের অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শত্রুগণও প্রবল হইয়া তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। তারপর ৺চন্দ্রকুমার বাবুর পক্ষ হইতে সমুদয় সিকিমি সম্পত্তি ইজারা বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া, সমস্ত মহলে একাধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক আমাদের আশ্রিত জনগণ প্রতি অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। যাঁহাদের অন্তঃকরণ দোদুল্যমান ছিল, তাঁহারা, ছোটহিস্যার পক্ষ অবলম্বন করিলেন, আর যাঁহারা আমাদের সুখে সুখী এবং আমাদের দুঃখে দুঃখী,— তাঁহারা সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। কর্ম্মচারিগণ মধ্যে ৺গুরুচরণ সেন, শ্রীযুক্ত নয়ন চন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত চন্দ্র কিশোর চট্টোপাধ্যায়, ৺রামদয়াল

দাস, ৺কালীদাস বক্সি প্রভৃতি অল্প কয়েকজন ব্যতীত আর সমস্ত লোকই ছোট হিস্যার (৺চন্দ্রকুমার বাবুর হিস্যার) অনুগত হইয়াছিল।

ছোট হিস্যার ম্যাদি ইজারা বন্দোবস্তের কালাতীত হইলে গভর্ণমেণ্টের খাসে প্রায় চারি বৎসর যাবৎ আদায় তহশীল নির্ব্বাহ হইয়াছিল। শুনিয়াছি তিন বৎসরের ম্যাদি ইজারায় ছোট হিস্যার বাবুর অনেক অর্থ দণ্ড হইয়াছিল।

পুনরায় ম্যাদি ইজারার বন্দোবস্তের নোটিশ হইলে, আমাদের পরম বান্ধব, একান্ত হিতৈষী ৺গুরুচরণ সেন, পিতৃদেবের বয়ঃপ্রাপ্ত কাল পর্য্যন্ত ইজারা গ্রহণ করিয়া অতিশয় পরিপাটির সহিত শাসন সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সন ১২৫৬ সালে ১৪ই আষাঢ় সোমবার খুলনা জেলার অন্তর্গত ভট্টপ্রতাপ নিবাসী ৺ কালীমোহন সেন মহাশয়ের কন্যার সহিত পিতৃদেব শুভ পরিণয় পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। আমার মাতৃদেবী তখন অত্যন্ত বালিকা ছিলেন। আমার পিতৃদেবও তখন কিশোর বয়স্ক।

মহাত্মা রেলি সাহেব তাঁহার সহধর্ম্মিণীসহ সেই শুভ কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি এই বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার লিপির মধ্যে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণ করিবার জন্য আমি তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম।

"তোমার পিতার যখন বিবাহ হইয়াছিল তখন তোমার মাতার বয়স খুব অল্প। আমি তোমার মাতাকে ক্রোড়ে ধারণ করিতে যত্ন করিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই আমার নিকট আসিতে স্বীকৃত হইল না। বালিকা বয়সে তোমার মাতার যে প্রকার লাবণ্যময়ী দেহকান্তি ছিল, বঙ্গমহিলাগণ মধ্যে ওরূপ সুন্দরী আমি আর কথনও দেখি নাই

মুখখানি সর্ব্বদা হাসিমাখা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলি নিখুঁত সুন্দর। তোমার মাতার শরীরের বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ আমি কখনও দেখি নাই।"

প্রকৃতপক্ষে আমার জননী অপার্থিব লাবণ্যময়ী নারী ছিলেন। সাক্ষাৎ দশভুজা দুর্গার ন্যায় মুখকান্তি ছিল। তিনি যেরূপ সুন্দরী তদ্রূপ অন্যান্য নানা প্রকার সদ্‌গুণেও অলঙ্কৃতা ছিলেন। ধীরা, সরলা পরদুঃখ-কাতরা, অহঙ্কার শূন্যা এবং আশ্রিতজন-প্রতিপালিকা ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যে অপরূপ মাতৃভাব ব্যক্ত করিত।

"আমার স্ত্রী তারপর তোমার মাতাকে ডাকিলেন, প্রথমতঃ নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যেও তিনি নিকটে আসিলেন না। তোমার মায়ের জন্য কতকগুলি বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলাম; সে গুলি আমার স্ত্রীর নিকটে ছিল। সেগুলি বাহির করিয়া তোমার মাতাকে ডাকিলে তিনি ধীরে ধীরে আমার স্ত্রীর নিকটে আসিলেন। আমার স্ত্রী ধীরে ধীরে সে সমস্ত অলঙ্কার তোমার মাতাকে পরাইয়া দিলেন। তখন এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ তাঁহার শরীর হইতে নির্গত হইতে লাগিল। অঙ্গস্থিত সুবর্ণের সহিত তাঁহার সুগৌর কান্তি মিলিত হইল। প্রকৃতপক্ষে একটী সুবর্ণ-নির্ম্মিতা দেবীমূর্ত্তির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।"

যখন পিতৃদেবের শুভ উদ্বাহ ক্রিয়া হয়, তখন তাঁহার বয়স দশ বৎসর এবং মাতৃদেবী ছয় বৎসর বয়স্কা ছিলেন।

বিবাহের অব্যবহিত পরেই তিনি পিত্রালয়ে গমন করিয়া ক্রমাগত ছয় বৎসর যাবত তথায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার রক্ষার্থ "ভাগী" নাম্নী প্রাচীনা ধাত্রী এবং চিকুরীসিংহ নামক একজন হিন্দুস্থানী বিশ্বস্ত ভৃত্য নিয়োজিত ছিল।

আমার পিতৃদেব যখন ঢাকায় পাঠাভ্যাস করিতেন তখন ছোট হিস্যা হইতে ৺ চন্দ্রকুমার বাবু আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তির আটআনী অংশের মালিক হইবার জন্য, পূর্ব্বকৃত দশআনী হইতে দুইআনী অংশ মৃত্ত ওয়াশীলাত পাইবার দাবিতে, বরিশালের আলাসদর-আমিনি আদালতে (সব্‌জজ কোর্টে) মবলক ৯৮,৭৫০্ টাকার দাবিতে, ইংরেজী ১৮৪৭ সালের ১৮৪নং মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন।

এই সময় আমাদের আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা ছোট হিস্যার উৎপীড়নে এবং ভয়ে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া অতিশয় কাতরভাবে কালাতিপাত করিতেছিলেন। এই মোকদ্দমাসংক্রান্ত যাবতীয় সাক্ষী এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দলিলপত্র নির্ব্বিঘ্নে ছোট হিস্যা হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রথম আদালতে মায় খরচ এবং ওয়াশীলাতসহ ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমার পিতৃদেব তখন নাবালক, সুতরাং তিনি স্বয়ং ব্রতী হইয়া কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন না।

এদিকে মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া ছোট হিস্যা হইতে আমাদের আশ্রিত জনগণ প্রতি এবং যাঁহারা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি কঠোর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন।

আমাদের পক্ষ হইতে ৺ নীলচন্দ্র সেন তখন অনন্যোপায় হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতে (হাইকোর্ট) আপীল দাখিল করায়, তাহা পুনঃ বিচারার্থ জেলা কোর্টে ওয়াপেচ্ আসিলে তাহাতেও পূর্ব্বের ন্যায় বিপক্ষগণ জয়লাভ করিল।

পুনঃ পুনঃ এই প্রকার জয়লাভ করিয়া বিপক্ষগণ আমাদের প্রতি

এতদূর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, তাহা এই পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহাদের মনঃপীড়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমার পিতৃদেব এবং তাঁহার অনুগত জন যে কতদূর কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত। তিনি দেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ছোট হিস্যার সহিত নিষ্পত্তির প্রস্তাব করিয়া দাবীকৃত দুই আনীর স্থানে এক আনী এবং অন্যান্য ওয়াশীলাত ও খরচ জন্য মঃ ৫০০০০ টাকা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

৺ চন্দ্রকুমার বাবু বৈষয়িক কোন কার্য্যে দক্ষ ছিলেন না, তাঁহার স্ত্রী যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ষ্টেট্ কেবল চন্দ্রকুমার বাবুর নামে চলিত।

এই নিষ্পত্তির প্রস্তাব উপস্থিত হইলে ছোট হিস্যার কর্ম্মচারিগণ মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ চলিতে লাগিল। কেহ বলেন, এক আনী বিত্ত আরও ৫০০০০ টাকা নগদ লইয়া নিষ্পত্তি করিলে দোষ কি? কিন্তু চন্দ্রকুমার বাবুর শ্যালক ৺ মহেশচন্দ্র রায় তখন সর্ব্বময় কর্ত্তা, তিনি সেই মীমাংসার প্রস্তাব অহঙ্কারের সহিত উপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "হয় আমার ভগ্নী রাজ্যেশ্বরী হইবে,নচেৎ আমার নাম বৃথা ; কিছুতেই এই নিষ্পত্তি করা কর্ত্তব্য নহে।"

তিনি প্রধান সুতরাং তাঁহার মতেই সকলে মত দিলেন। চন্দ্রকুমার বাবুকে তিনি যে প্রকার বুঝাইলেন, তিনিও সেই প্রকার বুঝিলেন। একদিন অপরাহ্নে উভয় পক্ষের কর্ত্তৃপক্ষগণ সমবেত হইলে, চন্দ্রকুমার বাবু স্বয়ং নিষ্পত্তি উপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিলেন। ছোট হিস্যার কর্ত্তৃপক্ষগণের অটুট বিশ্বাস যে, যখন তাঁহারা ক্রমাগত দুইবার জয়লাভ করিয়াছেন তখন কিছুতেই পরাস্ত হইবেন না। নগদ ৯৮,৭৫০ টাকা দুইআনী অংশ এবং তদুপরি দুই আদালতের মোক-

দ্দমার খরচে প্রায় লক্ষাধিক টাকার উপরে হইবে, ইহা ত্যাগ করিয়া একআনী অংশ এবং নগদ ৫০০০০ টাকা গ্রহণ করা কিছুতেই সঙ্গত নহে।

কিন্তু দর্পহারী ভগবান আছেন, তিনি দুর্ব্বলের রক্ষক, অহঙ্কারীর দর্প চূর্ণকারী। তিনি সমস্তই দেখিতে পাইলেন।

নিষ্পত্তি উপেক্ষিত হইলে আমার পিতৃদেব ছল ছল নেত্রে অমাত্য বর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "এতকাল পরে আমি দেশত্যাগী হইলাম। ঈশ্বর যদি আর কোন দিন মুখ তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন তবে আসিব, নচেৎ এই শেষ" এই বলিয়া সেই রাত্রিতেই নৌকা-রোহণে ঢাকায় রওয়ানা হইয়া গেলেন।

এদিকে নিম্ন আদালতের হুকুমের অসম্মতিতে কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল দায়ের করা হইল। ভগবান আমাদের উপর প্রসন্ন হইলেন; চন্দ্রকুমার বাবুর দাবী মায় ওয়াশীলাত ও খরচ সমেত ডিস্‌মিশ্‌ হইয়া আমাদের পক্ষে জয়লাভ হইল।

আমাদের আত্মীয় বন্ধুবর্গের বিষাদমুখে হাসি দেখা দিল; তাঁহারা যে এতকাল কায়মনোবাক্যে দর্পহারী ভগবানকে ডাকিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল। শুনিয়াছি যে ছোট হিস্যার কর্ত্রী এই সংবাদ পাইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন।

ছোট হিস্যা হইতে প্রিভিকাউন্‌সিল আপীল (Privycouncil Appeal) করিবার উদ্‌যোগ হইলে পুনরায় নিষ্পত্তির প্রস্তাব হইল। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর ছোট হিস্যার পক্ষ হইতে খরচ বাবদ ৫০০০ টাকা গ্রহণে সমস্ত দাবী পরিত্যাগ করতঃ পূর্ব্বকৃত দশআনী এবং ছয়আনী স্বীকারে উভয় পক্ষ "সলেনামা" দাখিল করিলেন।

এই মোকদ্দমা উপলক্ষে আমাদের দুই হিস্যার বিবাদের মূল

দূরীভূত হইল। একে অন্যের ছিদ্র প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক অপরকে নির্যাতন করিতে চেষ্টা পাইতেন।

সন ১২৬৪ সালের চৈত্র মাসের শেষে পিতৃদেব প্রাপ্তবয়স্ক হইলে সমস্ত সম্পত্তি কালেক্টরী হইতে খালাস হয়। তার পর বৎসর রীতিমত সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অপ্রতিহত প্রভাবে বিষয়কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তাঁহার অনুপস্থিতির সময় পর্য্যন্ত কীর্ত্তিপাশার সুখাকাশ ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন ছিল। আত্মীয় স্বজনগণ ম্রিয়মাণ ছিলেন; আবার তাঁহার আগমনে পূর্ব্বশ্রী বিকশিত হইল। শত্রুগণ ভীত হইয়া প্রমাদ গণিল, আশ্রিতগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার গুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন।

বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়া কতিপয় বৎসর পরে সেলিমাবাদ জমিদারীর একাংশ ক্রয় করিয়াছিলেন; এই জমিদারী খরিদ উপলক্ষে রায়েরকাঠির রাজাদের সঙ্গে নাকি অনেক মোকদ্দমা ইত্যাদি দ্বারা বিস্তর অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। তারপর পরগণে বোজরগ মেদপুর মধ্যে কয়েক কেত্তা খারিজা বিত্ত ক্রয় করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত কার্য্যান্তে যাবতীয় সিকিমি এবং খারিজা বিত্তের বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রজাগণের ইচ্ছানুসারে প্রায় দশহাজার টাকা স্থিত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

আমার পিতামহ দেবের মৃত্যুরপর আমাদের পুরাতন অনেক দলিল শত্রু কর্ত্তৃক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনেক জরীপি চিঠা নক্সা প্রজাওয়ারি হিসাব, মহালের, নামওয়ারি জমাওয়াশীল, প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক আবশ্যকীয় কাগজ, পিতৃদেব স্বয়ং অসাধারণ পরিশ্রম পূর্ব্বক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেই সমস্ত কাগজ পত্র এরূপ দক্ষ-

তার সহিত গঠিত হইয়াছে যে, অতি সাধারণ ব্যক্তিও তাহা দর্শন করিলে সমস্ত বিষয় অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। এই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তিনি অতিশয় পরিশ্রম :করিতেন। স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যকারকগণ দ্বারা কাগজ সকল প্রস্তুত করাইতেন।

এ সমুস্ত কার্য্য শেষ হইলে আমাদের সংসারের খরচ সম্বন্ধে একটী (Budget) প্রস্তুত করেন। আমাদের আহার্য্য সামগ্রী হইতে সংসার রক্ষার অতি সামান্য দ্রব্য পর্য্যন্ত তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির বহির্ভূত হয় নাই। এরূপ সুচারুরূপে সেই বজেট্ প্রস্তুত হইয়াছিল যে, কোন এক পর্ব্ব উপলক্ষে আমাদের কোন বিষয়ই চিন্তা করিতে হয় না। অদ্যাপি সেই বজেট্ অনুসারে আমাদের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

তারপর বাড়ীর ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ সকল জীর্ণ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। নীচের তালার দালান গুলি অতিশয় ঠাণ্ডা, এবং সর্ব্বদা সর্দ্দি উঠিত। পিতৃ ঠাকুর সেই সমস্ত দালানগুলির আবশ্যকমত দরজা বাহির করিয়া সমস্ত গুলির নীচে "জালা" বসাইয়া দিয়াছিলেন। বৃষ্টির জল নির্গত হইবার জন্য একটী সুদীর্ঘ পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করাইয়া পারিবারিক স্বাস্থ্য বিধান করিয়াছিলেন।

ইহার পূর্ব্বে আমাদের বহির্বাটীতে কোন প্রকার বৈঠকখানায় দালান ছিল না। পিতৃদেব নিজে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া দোতালার উপর একটী সুন্দর "হল" নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই সময় এই জেলায় ওরূপ সুন্দর অথচ প্রশস্ত "হল" আর কোথাও ছিল না, এবং অদ্য পর্য্যন্তও ওরূপ সুন্দর "হল" এই জেলায় আর আছে কিনা জানিতে পারি নাই।

বরিশালে পূর্ব্বে আমাদের বাসাবাড়ীতে দালান ছিল না। পিতৃ-

দেব বহুতর অর্থ ব্যয় করিয়া একটি সুন্দর "পাকা বাড়ী" প্রস্তুত করেন; কিন্তু দুর্ভগ্য বশতঃ সেই বাড়ী, সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

তৎকালে আমাদের এতদ্দেশে বালকগণের প্রাশ্চাত্য শিক্ষাপো-যোগী কোন প্রকার বিদ্যালয় ছিলনা। গ্রাম্য প্রাচীন গুরুমহাশয়গণ দ্বারা যৎসামান্য বাঙ্গলা শিক্ষা হইত। আমার পিতৃদেব সেই অভাব মোচন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু আমাদের দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং অন্যান্য প্রাচীন ব্যক্তিগণের বিশ্বাস ছিল, যে বালকগণ ইংরেজী শিক্ষা করিলে নিশ্চয়ই খৃষ্টান হইবে। আমার পিতৃদেব নিজব্যয়ে ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে গ্রাম্য ভদ্রলোকগণ এই প্রকার আপত্তি করিয়া তাঁহার মহদুদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করিতে লাগিলেন। তিনি কত বুঝাই-লেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের কুসংস্কার দূরীভূত হইল না।

এই সময় স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা বাবু দীনবন্ধু ন্যায়-রত্ন পিতৃদেবসহ সাক্ষাৎ কামনায় কীর্ত্তিপাশায় আগমন করেন। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, কীর্ত্তিপাশা এবং তন্নিকটস্থ গ্রামবাসিগণকে আহ্বান পূর্ব্বক স্কুল স্থাপনের উপকারিতা সম্বন্ধে এক মহতী বক্তৃতা প্রদান করিয়া, উপস্থিত সভ্য মণ্ডলীকে অনেক কথা বলিলেন। তাঁহার তেজস্বিনী বক্তৃতায় অনেকের মন ভিজিল; কিন্তু যাঁহারা প্রাচীন তাঁহাদের মন কিছুতেই টলিল না। আমার পিতৃদেব তখন স্কুল স্থাপন করিতে দৃঢ়ব্রত হইলেন। মাসিক ৪০টাকা বেতনে একজন ইংরেজী শিক্ষক আড়াই মাস কাল রাখিয়া-ছিলেন। কিন্তু একটি ছাত্রও আসে নাই, মাত্র এই বাড়ীর দুইটী ছাত্র দ্বারা স্কুল স্থাপিত হয়।

অল্প কয়েক মাস মধ্যে যখন গ্রাম্য ভদ্রলোকগণ বুঝিতে পারিলেন যে স্কুল স্থাপনাদ্বারা, উপকার ভিন্ন অপকার হইবার সম্ভব নাই, তখন তাঁহাদের বালকগণ রীতিমত স্কুলে আসিতে আরম্ভ করিল।

প্রথমতঃ ১৮৬৩ খৃঃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখ শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র ভদ্র মহাশয়ের বাড়ীতে এই স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। তারপর তিন মাস পরে উহা আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল।

সর্ব্বপ্রথম গভর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ১৫ টাকা সাহায্য-প্রাপ্ত হওয়া যাইত; তখন শুদ্ধ বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইত। তারপর গভর্ণমেণ্ট হইতে ২৬ টাকা পর্য্যন্ত সাহায্য হওয়ায় ১৮৭১ খৃঃষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর মধ্য ইংরেজী স্কুল নামে অভিহিত হইয়াছিল।

আমার পিতৃদেবের উৎসাহে এবং যত্নে স্কুলের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বৎসর বৎসর ছাত্রগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। গভর্ণমেণ্ট হইতে অবশেষে মাসিক ৫০ টাকা পর্য্যন্ত সাহায্য হইয়াছিল।

অনাথ এবং দরিদ্র রোগীদিগের ঔষধ এবং পথ্য বিতরণ করিবার জন্য ১৮৭২ খৃঃষ্টাব্দে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বয়ং উপস্থিত রোগীদিগের তত্বাবধান করিতেন।

অচিরাৎ তাঁহার নির্ম্মল যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। শত্রু, মিত্র সকলেই সমস্বরে তাঁহার লোকাতীত প্রতিভা, এবং পর হিতাকাঙ্ক্ষার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

আমার পিতৃদেব যে ইংরেজী ভাষায় অতিশয় বিদ্বান ছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি এবং কার্য্যতৎপরতায়, দ্বিগুণ প্রতিভা প্রকাশ পাইত। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার এরূপ বুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে, তিনি সাহেবদের সহিত অনর্গল ইংরেজীতে কথোপ-

কথন করিতে পারিতেন। আজ কাল আমরা যেমন স্থানে স্থানে ইংরেজী বিদ্যাবিশারদ বাঙ্গালী দেখিতে পাই, তৎকালে এই দেশীয় জমিদার শ্রেণীর মধ্যে খুব অল্প কয়েকজনই এই বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কোন সভায় দেশীয় জমিদারগণের নিমন্ত্রণ হইলে, আমার পিতৃদেব সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়া সেই সভায় যোগ দান করতঃ স্বীয় বাগ্মীতা'র বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেন।

ইংরেজ সমাজে তাঁহার অতিশয় প্রতিপত্তি ছিল। স্থানীয় মেজেষ্ট্রেট্, জজ প্রভৃতি হইতে কমিশনর এবং এবং লেপ্টেনণ্টগবর্ণর বাহাদুর পর্য্যন্ত তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতেন, এবং সকলেই তাঁহার সদালাপ ও সদ্ব্যবহারে অতিশয় আপ্যায়িত ও প্রীত হইতেন।

একদা ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্টগবর্ণর, ক্যাম্বেল সাহেব বরিশাল দর্শনার্থ আগমন করিলে, আমার পিতৃদেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব বাহাদুর তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া, অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "বাবু! আপনি এমে, পাশ করিয়াছেন ?"

পিতৃদেব তখন বিনম্র বচনে বলিলেন "না, সাহেব আমি ঢাকায়, সামান্য ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছি।"

সাহেব বলিলেন „আমি অনেক জমিদার, রাজা, মহারাজার সহিত আলাপ করিয়াছি ; কিন্তু কাহারও মুখে, আপনার ন্যায় ইংরেজী শুনিতে পাই নাই।"

শুনিয়াছি যে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহদুর, একদা পিতৃদেবকে বিশেষ সম্মান সূচক কোন উপাধি প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি কৃতাঞ্জলি পুটে বলিয়াছিলেন "ভগবৎকৃপায় রাজ পুরুষগণের অনুগ্রহ থাকিলেই, পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করিব। "এই চিরানুগত প্রজাউপাধি প্রাপ্তির সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

যে কয়েকদিন সাহেব বাহাদুর, বরিশালে ছিলেন, আমার পিতৃদেবকে কখনও তাঁহার নিকট হইতে স্থানান্তর করিয়াছিলেন না।

এই সময় বরিশালে "লোভি" হইয়াছিল। কলসকাঠির খ্যাতনামা জমিদার পুণ্যাত্মা ৺ বরদাকান্ত রায় চৌধুরীও ঐ "লোভি"তে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজী জানিতেন না; আমার পিতৃদেব তখন তাঁহাকে সাহেব বাহাদুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। এই সূত্রে তাঁহাদের মধ্যে অত্যন্ত সৌহৃদ্য স্থাপিত হইয়াছিল। চৌধুরী মহাশয় বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ; সুতরাং আমার পিতৃদেব তাঁহাকে বিশেষ সম্মান এবং ভক্তি করিতেন। তিনিও তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ ও সম্মান করিতেন।

১৮৭৬ সনে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল্ লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুর ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে এই জেলার জমিদারগণের মধ্যে একমাত্র আমার পিতৃদেবই নিমন্ত্রিত হইয়া, গবর্ণর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, স্বয়ং লেপ্টনাণ্ট গভর্ণর বাহাদুর তাঁহাকে ভাইচুরয়ের সহিত পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর পিতৃদেবের সদ্ব্যবহার ও সদালাপে পরিতুষ্ট হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৮৭৭ সালে প্রিন্সঅব্ওয়েলেস কলিকাতায় পদার্পণ করিলে, আমার পিতৃদেব তাঁহার দরবারে গিয়াছিলেন। সেইবার জুওলজিকাল গার্ডন (Zoological gardens) রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী (Royal Asiatic society) জমিদারি পঞ্চাইৎ (Zamindary Panchait) এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন (British Indian Association) প্রভৃতির সম্মানিত সভ্য হইয়াছিলেন।

সন ১২৭৬ সালের ফাল্গুন মাসে আমার তিনজন জ্যেষ্ঠা ভগিনীর

শুভ বিবাহ প্রদান করিয়াছিলেন। এই শুভ কার্য্যোপলক্ষে নানাস্থান হইতে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবগণ আহূত হইয়া শুভ কার্য্যের শ্রী সম্পাদন করিয়াছিলেন। দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, এবং আমাদের স্বজাতীয় সমাজের প্রধান প্রধান কুলীন মহাত্মাগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কলিকাতার তৎকালিক সর্ব্বোৎকৃষ্ট যাত্রার দল আনীত হইয়াছিল। শুনিয়াছি যে তৎকালে এই জেলায় এতদূর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কার্য্য আর কোথায়ও হয় নাই।

নানা কার্য্যে পিতৃদেবকে অত্যন্ত যশস্বী দর্শন করিয়া শত্রু মণ্ডলীর বিষম ঈর্ষ্যা উপস্থিত হইল। নানা প্রকার মোকদ্দমাদি করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তিনি অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে সমস্ত বিপদ হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইলেন।

আমার জ্যেষ্ঠাভগিনীত্রয়ের শুভ বিবাহের অব্যবহিত পরেই একটী গুরুতর মিথ্যা ফৌজদারী মোকদ্দমা উপলক্ষে গ্রেপ্তার ভয়ে পিতৃদেবকে নানা দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিয়া অত্যন্ত শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। জগদীশ্বরের কৃপায়, অচিরে সেই মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল।

সন ১২৭৯ সালে তিনি একখানি গ্রীন "বোট" নৌকা নির্ম্মাণ করিতে উদ্যোগী হইলেন। তৎকালে এইদেশস্থ মিস্ত্রীগণ গ্রীন বোট নির্ম্মাণে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। তিনি স্বয়ং অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ পূর্ব্বক দেশীয় মিস্ত্রী দ্বারা বোটখানি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। অমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর প্রশস্ত নৌকা এই জেলায় আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।

সন ১২৮১ সালে কার্ত্তিক মাসে, ইষ্টদেব ৺ চন্দ্রনাথ শিরোমণি, দুইজন ভৃত্য, দুইজন কর্ম্মচারী এবং একজন পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে

লইয়া, পিতৃদেব তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে প্রথমতঃ বৈদ্যনাথ, তৎপর পাটনা, হরিহরছত্র * তৎপরক্রমশঃ গয়া, কাশীধাম, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা (লক্ষ্ণৌ) কুরুক্ষেত্র, মথুরা, আগরা, শ্রীবৃন্দাবন, পুষ্কর, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, নীলাচল, দিল্লী, দধীচির আশ্রম, গাজিয়াবাদ, রুরকী, অমৃতসহর, অম্বলা, আজমীর, বুন্দী, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ১২৮২ সালের আষাঢ় মাসে স্বজন সমভিব্যাহারে নির্ব্বিঘ্নে স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

আজকাল যেমন ইংরাজ রাজত্বের কল্যানে ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় তীর্থস্থানে গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে, তৎকালে এরূপ সুবিধা ছিল না। স্থানে স্থানে পদব্রজে, ঘোড়ায়, এক্কা, প্রভৃতিতে গমনাগমন করিতে হইত। কোন কোন স্থানে বা লতার উপর ভর করিয়া দুর্গম গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিতে হইত।

কেবল যে পথ অতিশয় দুর্গম ছিল তাহা নহে, স্থানে স্থানে দস্যু ভীতিও ছিল। জয়পুর রাজ্যান্তর্গত মকরাণা নামক স্থানে দস্যুগণ তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। তথাকার জনৈক পাণ্ডা কর্ত্তৃক এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পিতৃদেব একাকী ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক অতি দ্রুতগামী এক তুরঙ্গমারোহণে প্রস্থান করিয়া জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মকরাণা হইতে অনেক শ্বেত ও রক্ত প্রস্তর নির্ম্মিত চেয়ার, টেবিল, সোফা (থট্টা) এবং থালা, বাটী প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি যে পরিমাণ এবং যে প্রকারের

* এই স্থান হইতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একটী তেজস্বিনী ঘোটকী খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন। ঘোটকী এখনও জীবিত আছে।

প্রস্তর নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনয়ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ উৎকৃষ্ট জিনিস সচারাচর দেখা যায় না।

তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় আমাদের বৈদ্যসমাজের প্রধান কুলীনস্থলী সেনহাটী গ্রামে কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পিতৃদেব তত্রত্য কুলীন মহোদয়গণের যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করেন, এবং তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও সদালাপনে সকলেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। দেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তীর্থ পার্ব্বণোপলক্ষে দেশীয় আত্মীয়স্বজন ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে অতি পরিপাটীরূপে আহার করাইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কার্য্য প্রতিবন্ধকতায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রম গমন করিতে প্রস্তুত হইলে পাণ্ডাগণ বলিল যে, প্রায় একদিনের পথ রজ্জুর পোল পার হইয়া যাইতে হয়। দুই পার্শ্বে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর হইতে অন্য পর্ব্বতশৃঙ্গ পর্য্যন্ত এই সেতুর উপর দিয়া যাইতে হয়। নীচে অতলস্পর্শী গভীর পার্ব্বত্য গুহা। পিতৃদেব তথাপি ধর্ম্মোদ্দেশে যাইতে প্রস্তুত হইলে, গুরুদেব তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। দেশে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় অন্যান্য তীর্থ দর্শনে অভিলাষী হইয়াছিলেন। আর কিছুকাল জীবিত থাকিলে যে তাঁহার এই সদিচ্ছা পূর্ণ হইত, তাহার কোন সন্দেহ ছিল না।

জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, বন্দী, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানের অধিপতিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। পুষ্কর তীর্থে যথাবিধি স্নানদান পূর্ব্বক ইষ্টদেব নিকট বেদমাতা গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

বাল্যজীবনে সর্ব্বদা ইংরেজ সমাজে যাতায়াত এবং সাহেব কর্ত্তৃক

পালিত হওয়ার গতিকে, সনাতন হিন্দুধর্ম্মে প্রথমতঃ তাঁহার পিতা পিতামহাদির ন্যায় প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল না। কিন্তু দীক্ষিত হইবার পর তীর্থ যাত্রান্তে হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার এতদূর বিশ্বাস স্থাপন হইয়াছিল যে, তিনি সর্ব্বদা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন এবং গূঢ় শাস্ত্রীয় সমস্যা পূর্ণ করিবার জন্য পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতেন।

সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার কোনপ্রকার দক্ষতা ছিল না, তজ্জন্য সময় সময় লজ্জিত হইতেন। কোন বন্ধুসমাজে গীত বাদ্যাদি হইলে তিনি প্রায়ই সে স্থানে উপস্থিত থাকিতে কুণ্ঠিত হইতেন। এমন কি দুই একস্থানে এই প্রকার লজ্জিত হইয়া, খ্যাতনামা ৮ চন্দ্রমোহন সাপলা এবং স্বনাম ধন্য শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ নিকট সামান্য বাদ্যাদি অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

পিতৃদেব অত্যন্ত কর্ম্মঠ ছিলেন; অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তে বৈষয়িক দৈনন্দিন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। মধ্যাহ্ন আহারাদি সমাপন হইলে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল সামান্য বিশ্রাম করিয়া সংবাদ পত্র এবং অন্যান্য বাঙ্গালা ইংরেজী এবং সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিতেন।

এই প্রকার ২।৩ ঘণ্টা কাল গত হইলে তিনি বাড়ীর কোন স্থানে কি কার্য্য হইতেছে তাহা স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। মজুর চাকরগণ হইতে অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ প্রভৃতি প্রত্যেক্যের নিকট গমন পূর্ব্বক দৈনিক কার্য্যের হিসাব গ্রহণ করিতেন! অপরাহ্নে পারিষদগণসমভিব্যাহারে তাঁহার অত্যন্ত আদরের "বোট" নৌকায় আগমন করিয়া সন্ধ্যা বায়ু সেবন করিতেন। রাত্রিতে বৈষয়িক গুরুতর পরামর্শ এবং মোকদ্দমাদির কার্য্যে অতিবাহিত হইত।

বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের যে প্রকার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, সন্তান সন্ততিগণ এবং জামাতৃগণেরও যাহাতে সুশিক্ষা লাভ হয়, তিনি তাহাতে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। আমার ভগিনীগণের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি একজন প্রাচীন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন। আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সেই সময় আমার বয়স ৯।১০ বৎসরের অধিক নহে। এই বয়সে আমরা যতদূর শিক্ষা সম্ভব, তাহারও বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

"বোট" নৌকা প্রস্তুত হইলে তিনি প্রজাপুঞ্জের বিশেষ অনুরোধে মফঃস্বল পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রত্যেক দীন প্রজাকে সাদরে আহ্বান পূর্ব্বক তাহাদের স্ব স্ব দুঃখ-কাহিনী শ্রবণান্তর সাধ্যানুসারে তাহাদের দুঃখ দূর করিয়াছিলেন। কোন প্রজা কোন দুঃখ-কাহিনী বিবৃত করিতে আসিলে অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের প্রতি নির্ভর না করিয়া তিনি স্বয়ং সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণান্তর তাহাদের দুঃখাপনোদনের যথোচিত বিধান করিতেন। প্রজা মধ্যে শান্তি স্থাপন করাই তাঁহার একমাত্র চেষ্টা ছিল। কোথাও প্রজাগণ মধ্যে কোন প্রকার বিবাদের সূচনা হইলে তিনি দুই পক্ষকে আনয়ন করিয়া অতি দক্ষতার সহিত উপযুক্ত মীমাংসা করিয়া দিতেন। যে বিচারে পরাস্ত হইত, সেও দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইত।

কোন ব্যক্তি কোন প্রকার গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়া সত্য কথা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলে তিনি পূর্ণ হৃদয়ে তাহাকে মার্জ্জনা করিতেন। তাঁহার শাসন সময় প্রজাগণ মধ্যে চৌরভয়, ব্যভিচার প্রভৃতি অন্তর্হিত হইয়াছিল।

ন্যায়পরায়ণতায় তিনি কদাচ কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁহার বিশেষ

আত্মীয় অথবা বন্ধুবর্গ প্রভৃতি মধ্যে কেহ কোন কুকার্য্য করিলে তিনি তাঁহাদের ক্ষমা করিতেন না। অন্যান্য সকলেও যে প্রকার দণ্ডনীয় হইতেন, বরং অন্যাপেক্ষা অপরাধকারী আত্মীয় প্রভৃতিকে তিনি সাতিশয় ঘৃণা করিতেন।

আমার বয়স যখন ৮ কি ৯ বৎসর তখন আমি একদা আমার সমবয়স্কগণসহ জনৈক মুসলমান বালকের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিলাম। সেই বালকটীকে প্রথমতঃ প্রহার করিয়া তারপর পুষ্করিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তীর হইতে ইষ্টকাদি নিক্ষেপ দ্বারা বালকের নানাস্থানে ক্ষত করিয়াছিলাম। আমার এই অসদাচরণ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি আমাকে স্বহস্তে কয়েকটী বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন। আমার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া স্বর্গীয় প্যারীমোহন দাস কবিরঞ্জন এবং ৺ গুরুচরণ সেন নাএব মহাশয় আগমন করতঃ আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া কবিরঞ্জন মহাশয় আমাকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক পিতৃঠাকুরকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পিতৃদেব যারপর নাই মান্য করিতেন; তাঁহার ভৎর্সনা শেষ হইলে পিতৃদেব বলিলেন, "বাল্যকালের উদ্ধত এবং অত্যাচারকারী স্বভাব পিতামাতা কর্ত্তৃক সংশোধিত না হইলে ভবিষ্যজীবনে অতিশয় অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।"

তারপর আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই বালক বাঁচিয়া থাকিলে ইহার বয়ঃপ্রাপ্ত সময়ে অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিবে। সমস্ত লোক জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িবে; সুতরাং বাল্য বয়সেই দোষ সংশোধন হওয়া কর্ত্তব্য।"

তাঁহার এই সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করতঃ কবিরঞ্জন মহাশয় প্রভৃতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

"বোট" নৌকা নির্ম্মিত হইলে, তিনি অবসরমত প্রায়ই সেই নৌকা আরোহণে বরিশাল, পিরোজপুর, প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন পূর্ব্বক, তথাকার প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারী, উকীল, এবং অন্যান্য ভদ্র মণ্ডলীর সহিত আলাপ করিতেন। শুনিয়াছি, যে তিনি বরিশাল আগমন করিলে জেলার যাবতীয় উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিতেন, এবং তাঁহারা সর্ব্বদাই তাঁহাকে বন্ধুভাব প্রদর্শন করিতেন। তিনি তাঁহাদের সহিত "পুনঃ সাক্ষাতের" (Return visit) দিবার অবকাশ পাইতেন না।

সন ১২৮৩ সাল, বাখরগঞ্জের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে আসিয়াছিল। এই বৎসর ১৬ই কার্ত্তিক তারিখ যে মহাঝড় হইয়াছিল, তাহাতে বাখরগঞ্জ জেলার অনেক স্থান ধ্বংশাবশেষ হইয়াছিল। বিশেষতঃ দৌলতখাঁ নামক মহকুমায় জন প্রাণীর চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার "বোট" খানি বরিশালে ছিল। পিতৃদেব, ঝড়ের ক্রমশঃ বৃদ্ধি দেখিয়া নৌকার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। তৎক্ষণাৎ সুদৃঢ় রজ্জু দ্বারা, নৌকা রক্ষায় যত্নবান হইলেন। তিনি স্বয়ং নদীতীরে আগমন করতঃ লোহার শিকল দ্বারা নৌকা আবদ্ধ করাইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে নৌকা শীঘ্রই জলমগ্ন হইয়া গেল।

এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র, তাঁহার চক্ষে জল আসিল; রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্র স্বয়ং নদীতীরে আগমন করিয়া দেখিলেন, যে স্থানে নৌকা আবদ্ধ ছিল, সেই স্থানে নৌকার চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান নাই। ডুবরী দ্বারা নদীগর্ত্তে অন্বেষণ করাইলেন, কিন্তু নৌকার কোন খোজ পাওয়া গেল না।

পিতৃদেবের বিশাল লোচন যুগল হইতে বাষ্পবারিধারা বিগলিত

হইতে লাগিল। তাঁহাকে অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখিয়া অনেকে বলিলেন, আপনার একখানা নৌকা গিয়াছে, আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে ওরূপ আর একখানি নৌকা প্রস্তুত করাইতে পারিবেন। এই তুচ্ছবিষয়ের জন্য আপনার ন্যায় ধীর এবং গম্ভীর প্রকৃতি লোকের অশ্রুবর্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে।

পিতৃদেব দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন "ভগবান আমাকে চারিটি পুত্র দিয়াছেন; অধিক কি বলিব আজ এই বোট হারাইয়া, আমার পুত্র শোকের শোক উপস্থিত হইয়াছে।"

প্রকৃত পক্ষে নৌকাখানির প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক স্নেহ ছিল। নৌকায় কোন প্রকার সামান্য আঘাত লাগিলে তিনি বড়ই কষ্ট অনুভব করিতেন। দৈবাৎ কোন স্থানে কোন ময়লা লাগিলে, তিনি কোন কোন সময়ে স্বহস্তেও তাহা পরিষ্কার করিতে উদ্যত হইতেন।

নদীর মধ্যে অনেক অনুসন্ধান দ্বারাও যখন নৌকা পাওয়া গেল না। তখন তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অশ্বারোহণে নদীর তীরে তীরে গমন করিতে লাগিলেন। সেই দিন নৌকার কোন সংবাদই পাওয়া গেল না।

পরদিন প্রাতঃকালে সংবাদ আসিল যে, "বোট" খানি বরিশাল হইতে প্রায় ৮ মাইল অন্তরে কর্ণকাঠি নামক স্থানে, নদীতীরে ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। তৎক্ষণাৎ নৌকা আনয়ন করিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল; বহুকষ্টে নৌকা আনীত হইলে দেখা গেল যে, ঝড়ে তাহার ছাদ উড়াইয়া নিয়াছে, এবং কপাট গ্লাস প্রভৃতির চিহ্ন মাত্র বর্ত্তমান নাই।

নৌকার অবস্থা দর্শন করিয়া, পিতৃদেব অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; ত্বরায় ভগ্নাবশেষ নৌকা মেরামত করিবার জন্য কীর্ত্তিপাশায় প্রেরিত

হইল। তাঁহার ঐকান্তিক বন্ধু চরামদ্দির খ্যাতনাম্না জমিদার শ্রীযুক্ত মৌলবী আছমতালিখাঁ চৌধুরী সাহেবের নৌকা আনাইয়া তাহাতে কার্ত্তিপাশায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

বাড়ীতে পঁহুছিয়াই নৌকা পুনরায় মেরামত করাইবার জন্য অনেক মিস্ত্রী নিযুক্ত করিলেন এবং স্বয়ং সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া কি প্রকারে মেরামত কার্য্য হইবে, তাহা দেখাইয়া দিতেন। ঐ সময় বৈষয়িক কার্য্যাদি অধিক সময়ই তথায় বসিয়া নির্ব্বাহ করিতেন।

এই প্রকারে কার্ত্তিক মাসের অবশিষ্ট কয়েক দিন গত হইল। আমাদের কাল স্বরূপ ২রা অগ্রহায়ণের দিনমান গত হইলে, সন্ধ্যার সময় পিতৃদেবের একবার দাস্ত হয়। বাল্যাবধিই তাঁহার সংগ্রহ গ্রহণী রোগ বর্ত্তমান ছিল। যৎকালে তাঁহার দাস্তের উদ্বেগ জন্মে, তখন তিনি নৌকা মেরামত স্থলে উপস্থিত ছিলেন।

এই প্রকার দাস্ত তাঁহার মধ্যে মধ্যে হইত, সুতরাং সে সম্বন্ধে তিনি কোন প্রকার ভীত হইলেন না, অথবা কোন ঔষধাদিও সেবন করিলেন না। সেই সময় আমাদের গ্রামের মধ্যে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে কলেরার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। উপর্য্যুপরি ৪।৫ বার দাস্ত এবং তৎসহ বমন হইলে সকলেই অতিশয় চিন্তিত হইয়া, ধন্বন্তরিকল্প ৺ প্যারীমোহন দাস মহাশয়কে আনয়ন করিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে রোগের প্রথম অবস্থা প্রায় অতিক্রম করিয়াছে। পিতৃ-ঠাকুর তখনও বেশ সতেজ, স্বয়ং শয্যা হইতে উঠিয়া পায়খানায় গমন করিতে পারেন। তাঁহার অসুখে সকলে ব্যস্ত হইয়াছেন দেখিয়া তিনি হাস্যমুখে সকলকে বলিলেন যে তাঁহার কোন প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হয় নাই, পূর্ব্বসঞ্চিত গ্রহণী রোগের আক্রমণ হইয়াছে মাত্র।

কিন্তু প্রবীণ চিকিৎসক সমস্তই বুঝিতে পারিয়া শিরে করাঘাত

করিতে লাগিলেন। রোগের পূর্ণ বিকাশ হইলে, পিতৃদেব শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র ভদ্র মহাশয়কে দেখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ভদ্র মহাশয় সরকারী কার্য্যোপলক্ষে মফঃস্বল যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় এই সাংঘাতিক রোগ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ব্যস্ত হইয়া আগমন করিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া, ভগ্নকণ্ঠে পিতৃদেব বলিলেন "রাজু দাদা! তোমার নিকট বিদায় হইতে বাকী ছিল; তুমি আসিয়াছ, এখন তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, যদি কোন দিন তোমার নিকট কোন প্রকার অপরাধ করিয়া থাকি, তুমি পূর্ণ হৃদয়ে আমাকে ক্ষমা কর।"

তাঁহার এই মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ ভদ্র মহাশয়ের লোচন যুগল হইতে দরদর করিয়া অশ্রুধারা পতন হইতে লাগিল। তিনি উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পিতৃদেব তখন বলিলেন "রাজু দাদা, তুমি আমার যাহা করিয়াছ, এজীবনে তোমার উপকার শোধ দেওয়া হইল না। আশীর্ব্বাদ করিও যেন জন্মান্তরে তোমার কতক উপকার করিতে পারি।"

তৎপর আমাকে এবং আমার ভগিনীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এই রাজু দাদা, ও রেইলী সাহেব না হইলে বহু পূর্ব্বে আমার অস্তিত্ব লোপ হইত; আমি চলিলাম কিন্তু দেখিও যেন, আমার অবর্ত্তমানে এই মহোপকারীর কোন প্রকার অনিষ্ট না হয়।"

তারপর ভদ্র মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "রাজুদাদা! ভাগ্যক্রমে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু আমার পিতৃকল্প

রেইলী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। এই বড় দুঃখ লইয়া চলিলাম।”

ভদ্র মহাশয় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন “বাবু! তোমার মুখে এই প্রকার হৃদয়ভেদি বাক্য শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই আমার মৃত্যু বাঞ্ছনীয় ছিল। হায়! হায়! কেন আমার মস্তকে এখনও বজ্রাঘাত হইতেছে না।”

ভদ্র মহাশয় অত্যন্ত আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পিতৃদেব তাঁহাকে বিলাপ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন “যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি জীবিত থাকিব, ততক্ষণ তুমি আমার শয্যাপার্শ্ব হইতে ক্ষণকালের নিমিত্তও স্থানান্তরিত হইও না।”

অত্যল্প সময় মধ্যে আবার মুহুর্মুহুঃ কয়েকবার দাস্ত এবং বমন হইয়া তিনি অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন; অন্যান্য সমস্ত দুর্লক্ষণ উপস্থিত হইল; শয্যায় শয়ন করিয়া যন্ত্রনায় এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন।

আমাদের দেশের মধ্যে যে কয়েকজন উপযুক্ত শাস্ত্রীয় চিকিৎসক এবং ডাক্তার ছিলেন, সকলেই আনীত হইয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন।

যখন আমদের এই প্রকার সর্ব্বনাশ হয়, তখন আমার বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর মাত্র। পিতৃস্নেহ যে কি, দেব দুর্ল্লভ সামগ্রী, তাহা তখন বুঝিতাম না; তথাপি যেন, তাঁহার শয্যাপার্শ্ব হইতে ক্ষণকালের জন্য স্থানান্তর হইতে ইচ্ছা হইত না। সমস্ত ঘটনা আমার বেশ মনে আছে, আমি তাঁহার বামপার্শ্বে বসিয়া, তাঁহার বক্ষঃস্থলে হাত বুলাইতাম। তাঁহার যাতনা দেখিয়া অজানিত রূপে আমার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইত।

রাত্রি প্রায় ১২ টার সময়, রোগের পূর্ণ বিকাশ হইল। ইষ্টদেব ৺ চন্দ্রনাথ শিরোমণি বাষ্প পরিপূরিত লোচনে, পিতৃঠাকুরকে ডাকিলেন "প্রসন্ন!"

তিনি তখন ঘোর তন্দ্রাভিভূত; অর্দ্ধ স্বরে বলিলেন "কেন?"

গুরুদেব হাহাকার করিয়া, কাঁদিয়া বলিলেন "প্রসন্ন আমাকে তাহার জীবন মধ্যে, "কেন" উত্তর করে নাই।"

তাঁহার ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, মা এবং আমরা সকলেই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম।

আমাদের ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তিনি নয়নোন্মীলন করিয়া, আমার মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সেই দীর্ঘনিশ্বাস, এবং তাঁহার সেই রোগক্লিষ্ট মুখখানি, যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন এই হৃদয়ে ধ্যান করিব।

সেই সময় আমার মাতৃদেবী, আমার ভাই ভগিনীগণসহ তাঁহার চরণ দর্শন করিতে আগমন করিলেন। আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার বয়স তখন আটমাস মাত্র; তাহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া, মাতৃদেবী, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে, তাহাকে আমার পিতৃ-ক্রোড়ে রক্ষা করিলেন।

পিতৃদেবের তখন পূর্ণ চৈতন্য; তিনি, আমার মাতৃদেবী, এবং আমাদের রোরুদ্যমান দেখিয়া, সকলকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

তিনি যতই প্রবোধ দিতে লাগিলেন, আমার মাতৃদেবী ততই বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে পিতৃদেব বলিলেন, "আমার কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, তাই; আমি যাইতেছি, এই অপগণ্ড শিশু সন্তানগুলির লালন পালনের ভার তোমার প্রতি ন্যস্ত হইল। এই সমস্ত ধন সম্পত্তি তুমিই রক্ষণা বেক্ষণ করিবে, দেখিও

যেন, ধর্ম্মপথ হইতে কদাচ বিচলিত না হও। আমি তোমাকে কত বুঝাইব, তুমি বুদ্ধিমতী, এবং ধার্ম্মিকা, অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।"

রাত্রিতেই ডাক্তার সাহেবকে আনিবার জন্য বরিশালে লোক প্রেরিত হইল। এদিকে রোগের পূর্ণ বিকাশ এবং সাংঘাতিক অবস্থা দর্শন করিয়া ৺গুরুচরণ সেন নাএব, শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন খাজাঞ্চী,* ৺শিবশঙ্কর সেন মহলানবিশ, ৺চন্দ্রনাথ শিরোমণি, শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর দাস পেস্কার, শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহলানবিশ প্রভৃতি তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে উইল প্রস্তুত করিয়া সেই রাত্রিতেই ঝালকাঠীর সবরেজেষ্টার জনদেছিল বা সাহেবকে আনয়ন পূর্ব্বক রেজেষ্টরী কার্য্য সমাধা করিলেন।

অতি কষ্টে সেই দুঃখের দীর্ঘ রাত্রি প্রভাত হইল; কিন্তু এত ঔষধ সেবনেও রোগের কোনপ্রকার উপশম হওয়া দূরে থাকুক, বরং উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

৺প্যারীমোহন কবিরঞ্জন মহাশয় সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই জীবনাশা নাই বলিয়া অবিরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় অকস্মাৎ তাঁহার একটা মূর্চ্ছা হইলে সকলে তখন ধরাধরি করিয়া নীচে লইয়া গেল; তুমুল আর্ত্তনাদে গৃহ পরিপূর্ণ হইল!

পিতৃদেবের একটা পোষা কুকুর ছিল। যখন তাঁহাকে নীচে নামাইবার জন্য সকলে সিঁড়ি অবরোহণ করিতেছিল, তখন ঐ কুকুর কোন ক্রমেই পথ ত্যাগ করে নাই। পিতৃঠাকুরের স্বর্গারোহণের পর প্রভুভক্ত কুকুর কোন প্রকার খাদ্য স্পর্শ করে নাই। দিবানিশি তাঁহার সমাধি স্থলেই পড়িয়া থাকিত। আমরা চেষ্টা করিয়াও তাহাকে

* গত ১৩ই আশ্বিন ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

স্থানান্তরে আনিলে একটু পরেই আবার সেই স্থানে গমন করিত। ঐ সমাধি স্থলেই অল্পদিন পরে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

ক্রমে সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িতে লাগিলেন; আমাদের ভাবী অমঙ্গল দর্শনেই যেন তিনি মলিন হইয়া ধীরে ধীরে অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইতে লাগিলেন।

এদিকে ডাক্তার সাহেবকে আনিবার জন্য যে লোক বরিশালে প্রেরিত হইয়াছিল, তথায় গিয়া জানিতে পারিল যে, ডাক্তার সাহেব কার্য্যব্যপদেশে মফঃস্বলে গমন করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যভার আসি-ষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র সিংহের প্রতি অর্পিত ছিল। তিনি মেজিষ্ট্রেট সাহেবের বিনা অনুমতিতে কাহার নিকট চার্জ্জ রাখিয়া আসিবেন; সুতরাং তিনি আসিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগি-লেন। মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বার্টন সাহেব পিতৃদেবের ব্যারামের কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তার বাবুকে আসিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

এই সমস্ত গোলযোগে বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইল; পূর্ণ বাবু, আত্মীয় প্রবর শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ সেন ডাক্তার আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীযুক্ত নয়নচন্দ্র সেন তৎক্ষণাৎ কীর্ত্তিপাশায় রওয়ানা হইলেন।

এদিকে আমরা ডাক্তারের প্রত্যাশায় পথ পানে চাহিয়া রহিলাম। সূর্য্য অস্তগত হইলেন, কালনিশা বিভীষিকা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপনীতা হইল। ক্রমে ত্রিযামার এক যামগত হইল, তথাপি ডাক্তার আসিলেন না।

পিতৃঠাকুর তখন অসহ্য যন্ত্রণায় শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতেছেন, সকলের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন এবং সময়ে সময়ে ডাক্তার

সাহেব আসিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বোধ হয় তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ছিল যে ডাক্তার সাহেব আসিলে তাঁহার জীবন রক্ষা হইবার সম্ভব।

ইতিপূর্ব্বে স্বনাম খ্যাত ৺ স্বরূপচন্দ্র গুহ উকীল মহাশয় মৃতকল্প হইয়া নারায়ণ ক্ষেত্রে নীত হইয়াছিলেন। ডাক্তার বেনসিলি তথন একটা ভেড়ার শরীরের রক্ত মোক্ষণ পূর্ব্বক রোগীর শরীরে ঐ শোণিত প্রবেশ করাইয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এই প্রকার আশ্চর্য্য ডাক্তারি চিকিৎসা এদেশে কথন আর কোথায়ও হয় নাই। উকীল বাবু সেই প্রকার জীবন দান প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল জীবিত ছিলেন।

পিতৃঠাকুরেরও বিশ্বাস ছিল যে, ডাক্তার সাহেব অবশ্যই কোন না কোন প্রক্রিয়া দ্বারা তাঁহার জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিতে সক্ষম হইবেন। এই জন্যই মধ্যে মধ্যে ডাক্তার সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

রাত্রি যতই বেশী হইতে লাগিল, রোগ যন্ত্রণা ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আত্মীয় স্বজনগণ সকলেই শয্যার পার্শ্বে অশ্রুপূর্ণলোচনে উপবেশন করিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছিলেন।

আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি সেই সময় তাঁহার পদপ্রান্তে স্থান পাইয়াছিলাম না। গত নিশা জাগরণ হেতু সন্ধ্যার পরই আমার অত্যন্ত নিদ্রার আবেশ হইয়াছিল। কালনিদ্রাই আমাকে সেই স্বর্গীয় চরণ দর্শন করিতে বাধা দিয়াছিল। জীবিতাবস্থায় আমি আর পিতৃ-চরণ দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম না।

আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং মধ্যমা ভগিনী সর্ব্বদাই পিতৃ সন্নিধানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সাধ্যানুসারে তাঁহার শ্রীচরণ

যুগল পূজা করিয়া ধন্যা হইয়াছিলেন। কেবল এই হতভাগ্যের অদৃষ্টে বিধাতা সেই পুণ্যটুকু লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন না।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর গত হইলে পূর্ণ বাবু উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে স্বাগত দেখিয়া পিতৃদেব ডাক্তার সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, বোধ হয় তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে সিবিল সার্জ্জন (Civil Surgeon) এবং আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন (Assistant Surgeon) উভয়েই আসিয়াছেন। পূর্ণ বাবুর প্রমুখাৎ ডাক্তার সাহেবের না আসিবার কারণ অবগত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ইংরেজীতে পূর্ণ বাবুকে বলিলেন, "যদি বুঝিতে পারেন যে আপনার সুচিকিৎসায় আমার জীবনরক্ষা হইবে তাহা হইলে আপনি চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হ'ন। আর যদি বুঝিতে পারেন যে, আমার আসন্নকাল নিকট-বর্ত্তী, তাহা হইলে আমাকে মৃত্যুশয্যায় আর কষ্ট প্রদান করিবেন না।"

পূর্ণবাবুর সহিত পিতৃদেবের অত্যন্ত সৌহৃদ্য ছিল, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া, ডাক্তার বাবুর নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি মুখে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া শরীরের প্রত্যেক স্থান বিশেষরূপ পরীক্ষা করতঃ দেখিতে পাইলেন যে কোথাও এক বিন্দু রক্ত সতেজ-ভাবে চলিতেছে না। তিনি দেখিয়া শুনিয়া হতাশ হইলেন। আমার পিতৃদেব পূর্ব্বেই সমস্ত বুঝিয়াছিলেন। তিনি ডাক্তার বাবুকে সম্বোধন করিয়া ইংরাজীতে বলিলেন, "তবে কেন বৃথা চেষ্টা করি-তেছেন!"

ডাক্তার বাবু মনের ভাব লুকাইয়া বলিলেন, "আপনি হতাশ হই-বেন না, ব্যারাম কঠিন হইলেও আরোগ্যের আশা আছে।"

এই কথায় পিতৃঠাকুর ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন, "আরোগ্যের আর অনেকক্ষণ বিলম্ব নাই।"

পূর্ণবাবু তখন হাইপডারমিকসিরিঞ্জ (Hypodermic Syringe) দ্বারা শিরার মধ্যে ঔষধি দিতে চাহিলে, পিতৃদেব বলিলেন, "কেন, আমার শরীর বৃথা ক্ষত করিবেন।"

ডাক্তারগণের এই চিকিৎসাই নাকি শেষ চিকিৎসা ; তিনি তীব্র বলকারক ঔষধ সমূহ, প্রয়োগ করিয়া বলিলেন, "যদি এই প্রক্রিয়ায় শরীর সামান্য উষ্ণ হয়, তবে চিকিৎসা দ্বারা জীবন রক্ষা হইলেও হইতে পারে।"

এক ঘণ্টা গত হইল ; কিন্তু কিছুতেই শরীর উষ্ণ হইল না। বরং শ্বাস-বেগ বর্দ্ধিত হইল। পিতৃঠাকুর সময় বুঝিয়া, ইষ্টদেবকে স্মরণ করিলেন। গুরুদেব হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার শিয়রে উপস্থিত হইলেন।

সে সময় পর্য্যন্তও তাঁহার বাক্য কথনের শক্তি রোধ হয় নাই ; গুরুদেবের চরণ-কমল প্রার্থনা করিলে, তিনি, পিতৃদেবের মস্তকোপরি, তাঁহার শ্রীচরণ স্থাপনপূর্ব্বক অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দর্শন করিয়া পূর্ণবাবু, রোদন করিতে করিতে তথা হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর সমগ্র বাথরগঞ্জ জেলা শোকসাগরে ভাসাইয়া, আমাদের অকালে পিতৃহীন করিয়া, ৩রা অগ্রহায়ণ শুক্রবার শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে রাত্রি ২টা ৩৫ মিনিটের সময়, পিতৃদেব স্বজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করিলেন।

চতুর্দ্দিক গভীর ক্রন্দনধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। আমার মাতৃদেবীর অবস্থা বর্ণন অসাধ্য ; তিনি মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিতা হইতে লাগিলেন ; যখন সামান্য সময়ের জন্য একটু চৈতন্য হইত, তখন তাঁহার হৃদয়-ভেদী আর্ত্তনাদে, পাষাণ পর্য্যন্তও বিগলিত হইত। আমার জ্যেষ্ঠা

ভগিনীগণের অবস্থাও বর্ণনাতীত। তাঁহারা, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। আত্মীয়, স্বজন, অমাত্যবর্গ, যে যে স্থানে ছিলেন, সকলেই ভূলুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন; কে, কাহারে সান্ত্বনা করে, সকলেই মর্ম্মভেদী দারুণ শোকাচ্ছন্ন। সকলেই হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

আমি হতভাগ্য, তখন গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন, এদিকে যে প্রত্যক্ষ ঈশ্বরস্বরূপ স্বয়ং পিতৃদেব, অকালে স্বর্গারোহণ করিতেছেন, আমি হতভাগ্য, তাহা জানিতে পারিলাম না। এত হৃদয়ভেদী গভীর রোদন নিনাদ, আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই। আমি মৃতবৎ শয্যায় পড়িয়াছিলাম।

সব শেষ হইলে পর ৺ গুরুচরণ সেন নাএক এবং শ্রীযুক্ত নয়নচন্দ্র সেন আমাকে পিতৃ-অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন জন্য শ্মশানে লইয়া গিয়াছিলেন। তখন জাগ্রত হইয়া জানিতে পারিলাম যে, আমাদিগকে অনাথ করিয়া আমার স্নেহময় পিতা, মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

অনতিবিলম্বে চিতা প্রস্তুত হইল। পূত শরীর তাহার উপর শয়ন করাইয়া, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে, সেই দেবকান্তি অচিরে ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। সেই শোকাবহ হৃদয় বিদারক দৃশ্য আজীবন আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে। মৃত্যু সময় পর্য্যন্তও সেই শোকচ্ছবি বিস্মৃত হইতে পারিব না।

যে মহাসূর্য্য, বাখরগঞ্জাকাশে উদিত হইয়া, স্বীয় রশ্মিজালে, সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা মধ্যাহ্ন সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই অকালে অস্তমিত হইলেন। শারদীয় পৌর্ণমাসীর নৈশগগনস্থ পূর্ণচন্দ্র অকালে রাহুকবলিত হইল। বিধাতার নিয়মানুসারে চন্দ্র, রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত পাইয়া থাকেন, কিন্তু এই রাহুকবলিত চন্দ্র

আর প্রকাশিত হইলেন না। অচিরে সেই বিশ্বপতির শ্রীপাদপদ্মে বিলীন হইলেন।

বনমালী নামক একজন প্রভুভক্ত ভৃত্য আমার পিতৃদেবের সঙ্গে সঙ্গেই গমন করিয়াছিল। আমার পিতৃদেবের ব্যারাম যখন পূর্ণ বিকাশ, তখন বনমালীর ঐ সর্ব্বগ্রাসী ভীষণ ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছিল। যখন পিতৃঠাকুরের জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ হইয়াছিল, তখন বনমালী প্রভুর সঙ্গে যাইবার জন্য ভীষণ রোগ-যাতনা লুকাইয়া প্রভুর সেবা করিতেছিল।

যে রাত্রিতে তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন, তাহার পরদিন বেলা চারিদণ্ডের সময়, প্রভুভক্ত ভৃত্য, প্রভুসেবার্থ মহাপ্রস্থান করিল। যতক্ষণ জীবিত ছিল, ততক্ষণ কেবল পিতৃদেবের রোগ আরোগ্য সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।



অষ্টম পরিচ্ছেদ।

(মদীশ্বরী-স্বর্গীয় মাতৃদেবী।)

আমার পিতৃদেবের মৃত্যুর অল্প কয়েকদিবস পরে শত্রুপক্ষ হইতে কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকট এক দরখাস্ত হইল যে, আমার পিতৃদেব কোন চরমপত্র (Will) রাখিয়া যান নাই। সুতরাং ষ্টেট-কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে যাওয়া কর্ত্তব্য। মেজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে, জি, বারটন সাহেব সেই দরখস্তের মর্ম্ম অবগত হইয়া অগৌণে কীর্ত্তিপাশা পহুঁছিলেন। তিনি সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে চাহিলে, তাঁহার নিকট উইল প্রদর্শিত হইল। কিন্তু জানিনা কেন তিনি এই উইল অবিশ্বাস করিয়া সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমার পিতৃদেবের আদ্যকৃত্যের মধ্যেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। একে আমরা কয়েকটি ভ্রাতা নিতান্ত শিশু, তাহাতে মাতৃদেবী তখন পতিশোকে একান্ত কাতরা, শত্রুগণ সুযোগ পাইয়া নানাবিধ অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। শুনিয়াছি যে, কেহ কেহ নাকি গোপনে কালেক্টর বাহাদুরের নিকটে আমাদের ষ্টেট কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে দেওয়ার জন্য যারপরনাই চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কালেক্টর সাহেব আমাদের কোন কথাই বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমার মাতৃদেবী এই বিপুল সম্পত্তি কিছুতেই শাসন সংরক্ষণ করিতে পারিবেন না। তিনি, বোধ করি, জানিতেন না যে, রাণী এলিজাবেথ, সুলতানা রেজিয়া, সাহাজাদা জীবন্নেচ্ছা, সাহাজাদা রৌশেন্বরা প্রভৃতির ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ রমণী বঙ্গভূমে আছে। বোধ হয় তখন মহারাণী স্বর্ণময়ী, এবং স্বর্গীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরীর নাম তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। আমার জননী তদ্রূপ প্রতিভাময়ী না হইলেও, তিনি বাখরগঞ্জের অনেক ভূম্যধিকারী হইতে, জমিদারী কার্য্যে অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও নীতিকুশলা ছিলেন।

প্রবেট পাইবার জন্য মোকদ্দমা স্থাপন হইল! প্রথম আদালতে শত্রুগণের ষড়যন্ত্রে, আমরা মোকদ্দমায় হারিলাম।

এই সময় মুখে আমাদের নিকট অনেকে আত্মীয়তা প্রকাশ করিতেন বটে, কিন্তু অন্তরালে তাঁহারা আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলে কিছুতেই কুণ্ঠিত হইতেন না। কেবল কয়েকজন লোক আমাদের ঐকান্তিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তন্মধ্যে ৺ গুরুচরণ সেন নাএব, শ্রীযুক্ত নয়নচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর দাস, ৺ প্যারিমোহন দাস কবিরঞ্জন, ৺ রামদয়াল দাস, ৺ গঙ্গাপ্রসাদ সেন, শ্রীযুত দ্বারিকানাথ সেন মাষ্টার, ৺ মহিমাচন্দ্র দাস বক্‌সি, শ্রীযুত ক্ষীরোদচন্দ্র বক্‌সি প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্রলোক মনে প্রাণে আমাদের মঙ্গলে রত ছিলেন।

অগৌণে নিম্ন আদালতের হুকুমের অসম্মতিতে কমিশনারিতে আপীল করাইলে তথা হইতে কালেক্টর সাহেবের উপর হুকুম হইল যে, আমার মাতৃদেবী বাঙ্গালা লেখাপড়ায় এবং জমিদারী কার্য্যে দক্ষ কিনা তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া মন্তব্য কমিশনারিতে প্রেরিত

হয়। কালেক্টর সাহেব কীর্ত্তিপাশায় পহুঁছিয়া, কমিশনার সাহেবের হুকুম প্রচার করিলে, আমার মাতৃদেবী পরীক্ষা দিতে সম্মত হইলেন।

একখানি পরদার অন্তরালে মাতৃদেবী থাকিলেন। বাহিরে আমি এবং আমার স্কন্তরালে আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ভগিনী বসিয়াছিলেন। ঘরের বারাণ্ডায় কালেক্টর সাহেব এবং আমাদের বাড়ীর অন্যান্য অমাত্যবর্গ, কুটুম্ব এবং আরও বিস্তর লোক জড় হইয়াছিল।

কালেক্টরির পেস্কার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, মাতৃদেবী যবনিকার অন্তরাল হইতে সেই সমস্ত প্রশ্নের যথোচিত উত্তর আমার নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। আমি সেই উত্তর বলিতে লাগিলাম।

এইরূপে পরীক্ষা শেষ হইলে পর কালেক্টর সাহেবের ভ্রম অপনোদন হইল, আমার মাতৃদেবী প্রকৃতপক্ষে বিদূষী নারী ছিলেন।

কালেক্টর সাহেবের রিপোর্ট কমিশনারি আফিসে পঁহুছিলে, তথা হইতে প্রবেট দিবার আজ্ঞা হইল। জনৈক ডিপুটি কালেক্টর স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া ক্রোক খালাস প্রদান করিয়াছিলেন।

বৈষয়িক কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া মাতৃদেবী অসাধারণ অধ্যবসায় এবং ন্যায়পরায়ণতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানের বন্দোবস্ত বাকী ছিল, তাহা স্বয়ং নির্ব্বাহ করিলেন। যে সমস্ত প্রজা এবং কর্ম্মচারী বিপদের সময় বিশ্বাসঘাতকার কার্য্য করিয়াছিল, তাহাদের যথোচিত শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক দূর করিয়া দিয়াছিলেন।

অচিরাৎ তাঁহার সুখ্যাতি নানাদিকে প্রচারিত হইল। শত্রুগণ ভাবিয়াছিল যে স্ত্রীলোকের প্রতি যখন কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে, তখন তাহারা সুযোগমত স্বকার্য্য উদ্ধার করিবে। কিন্তু আমার মাতৃ-

দেবী এমনি বুদ্ধিমতী ছিলেন, যে, শত্রুগণের ষড়যন্ত্র কৌশলে ব্যর্থ করিলেন।

অল্পকাল মধ্যে ষ্টেটের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহার সুশাসনে অমাত্যবর্গ ও প্রজাবর্গ আপামর সাধারণে তাঁহাকে বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

১২৮৬ সালে আমার পিতৃদেবের সমাধিস্থলে বিবিধ কারুকার্য্য-খচিত একটী সুন্দর শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এতদুপলক্ষে দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং আত্মীয় স্বজন নিমন্ত্রিত হইয়া এই পুণ্য কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

আমার পিতৃদেব জীবিত থাকা সময়ে আমার অবিবাহিতা ভগ্নী দ্বয়ের শুভবিবাহ সম্বন্ধ কার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন। এত হঠাৎ তাঁহার মানবলীলা না ফুরাইলে, তিনি মহা সমারোহে এই শুভ উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদন করাইতেন। আমার মাতৃদেবী, পিতৃদেবের মৃত্যুর সংবৎসর পরেই এই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। শুভ উৎসবে তিনি শোকাশ্রু মিশাইয়া, কোন প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

মাতৃদেবী বিধবা হইবার পর হইতেই দিন দিন শীর্ণা এবং দুর্ব্বলা হইতেছিলেন। সংগ্রহ গ্রহিণী এবং মূর্চ্ছা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ব্যাধি তাঁহার ছিল না। কিন্তু বিধবা হইবার অব্যবহিত পর হইতেই নানা প্রকার উৎকট ব্যাধিতে তিনি সর্ব্বদা কষ্ট পাইতেন।

সর্ব্বদা পূজা, সন্ধ্যা প্রভৃতিতে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। বৈষয়িক কার্য্য সমাধান্তে তিনি পারমার্থিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। সূর্য্যাস্তের অত্যল্প পূর্ব্বেই হবিষ্য করিতেন। মাসের মধ্যে প্রায় আট দশ দিন উপবাসী থাকিতেন, এবং প্রত্যেক পর্ব্বোপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতেন। স্বয়ং পাকস্থলে উপস্থিত থাকিয়া ব্রাহ্মণ-

সেবার জন্য নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইতেন। বিধবা হইলে পর, দুইটী সাধ ব্যতীত তাঁহার জীবনের কোন প্রকার স্বচ্ছন্দতা ছিল না। একটী—ব্রাহ্মণ-ভোজন ও দেবসেবা, দ্বিতীয়টী স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতি নানাবিধ উপাদেয় আহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া আপামর সাধারণকে পরিতৃপ্তরূপে ভোজন করান। মাসের মধ্যে প্রায় পনর দিন তিনি স্বয়ং রন্ধনশালায় গমন পূর্ব্বক স্বহস্তে নানা প্রকার উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে প্রত্যেককে পরিবেশন করিতেন। সেই সময় তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে অপূর্ব্বানন্দ-জ্যোতিঃ প্রকটিত হইত। স্বয়ং ভগবতী অন্নপূর্ণার ন্যায় প্রত্যেকের নিকট যাইয়া আকণ্ঠ ভোজন করাইতেন।

তাঁহার শারীরিক দুর্ব্বলতা দেখিয়া সময়ে সময়ে আমরা তাঁহাকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে নিষেধ করিতাম। তিনি সহাস্য-বদনে বলিতেন "মানুষকে পরিতৃপ্ত করিয়া অন্নদান করিবার ন্যায় ধর্ম্ম আর এ জগতে নাই। তোরা আমাকে নিষেধ করিস্ না; যতদিন এই পৃথিবীতে আছি, ততদিন যেন ভগবান আমাকে এই সৎকার্য্যে নিয়োজিত করেন।" আমরা নিস্তব্ধ হইতাম।

স্বনামধন্য খ্যাতনামা পণ্ডিতপ্রবর মহাত্মা শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস্, সি, আই, ই, যখন বাখরগঞ্জ জেলার মাজিষ্ট্রেট তখন তিনি কোন কার্য্যোপলক্ষে পরিদর্শনার্থ কীর্ত্তিপাশায় আগমন করিয়াছিলেন। আমার মাতৃদেবী স্বহস্তে নানা প্রকার উপাদেয় আহার্য্য সামগ্রী অত্যল্প সময় মধ্যে প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে আহার করাইয়াছিলেন। মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১২৮৩ সালের বৈশাখ মাস হইতে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পারায়ণোপ-

লক্ষে নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণমণ্ডলী তচ্ছ্রবণার্থ সমবেত হইয়াছিলেন। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সীতাদেবী প্রভৃতির মৃণ্ময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মহা সমারোহে পূজা দেওয়া হইয়াছিল। পুস্তক আরম্ভ হইতে দক্ষিণা শেষ পর্য্যন্ত যেন একটী মহোৎসব হইয়াছিল। খুলনা নিবাসী খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর শিরোমণি কথকতার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

রায়েরকাঠির খ্যাতনামা রাজবংশধর মহাত্মা ৺ রাজা মাধবনারায়ণ রায় মহাশয় আমাদের ষ্টেটের প্রায় ১০০০০৲ হাজার টাকার ঋণী হইয়াছিলেন। এই টাকা সম্যক আদায় করিতে হইলে, তাঁহার জমিদারী বিক্রয় না করিলে সঙ্কুলন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি অনন্যোপায় হইয়া কীর্ত্তিপাশায় আগমন পূর্ব্বক আমার মাতৃ সন্নিধানে দুঃখ-কাহিনী জানাইয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইলেন।

মা আমার প্রকৃতই দয়াময়ী ছিলেন; এক জনের দুঃখ দেখিলে তাঁহার অন্তঃকরণ ব্যথিত হইত। রাজা মাধবনারায়ণের দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহার দয়া-প্রবণহৃদয় কাঁদিয়া উঠিল।

রাজা বলিলেন—"মা! যে বংশের বংশধরগণ এখন পর্য্যন্ত কোথাও কৃপাভিখারী হয় নাই, আজ সেই বংশের একজন দীন সন্তান, তোমার কৃপাপ্রার্থী হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। শুনিয়াছি, যে তোমার স্বামীর পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মা কৃষ্ণরাম মজুমদার জীবনত্যাগ সঙ্কল্প করিয়া নবাবের নিকট হইতে, আমার পূর্ব্বপুরুষের রাজত্ব রক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের বংশাবলী এই পৃথিবীতে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা সেই মহাত্মার নিকট ঋণী থাকিব। মা! তুমি সেই বংশের কুলবধূ, তুমি কি আমাকে চিরদুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়া মাতৃস্নেহের পরিচয় প্রদান করিবে না?

দৈববিড়ম্বনায় আমাদের পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ধ্বংশ হইয়াছে; এখনও আমাদের যৎসামান্য যে সম্পত্তি আছে, তদ্দ্বারা কোন প্রকার সামান্য ভাবে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইতে পারে। তুমি রক্ষা না করিলে এই সুবৃহৎ পরিবার লইয়া কোথায় যাইব? কে এই অসূর্য্যম্পশ্যা কুল-মহিলাগণের সম্মান রক্ষা করিবে?"

রাজার এই প্রকার মর্ম্মভেদী দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া, জননীর লোচনযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি নাএব মহাশয়কে বলিলেন—"এই রাজার পূর্ব্বপুরুষ হইতেই আমাদের এই সম্পত্তি সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের দ্বারা যে ইহাদের কোন প্রকার অপকার হয়, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। বরং তাহা হইলে আমাদের গুরুতর অধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে। যদি ১০০০০৲ হাজার টাকা হইতে মুক্তি পাইলে ইহার সম্পত্তি রক্ষা হয়; তাহা হইলে আমি পূর্ণহৃদয়ের সহিত তাঁহাকে সেই টাকার ঋণ হইতে মুক্তি প্রদান করিলাম। আপনি তাঁহাকে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন। আমার পুত্রগণ নাবালগ, বিশেষ ষ্টেটের অবস্থা এখন ততদূর সচ্ছল নহে, নচেৎ আমি অন্য প্রকারে ইহার অভাব-মোচন করিতে চেষ্টা করিতাম।"

রাজা মাধবনারায়ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে অধীর হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সকলে মাতৃদেবীকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন "মা! আজ জানিলাম যে তুমি যথার্থ দয়াময়ী পরের দুঃখ দূর করিবার জন্যই পৃথিবী তলে শাপ ভ্রষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। আমি বহুদিন মাতৃহারা হইয়াছিলাম; আজ আমার সেই দুঃখ ঘুচিয়াছে। জানিলাম যে আমার গর্ভধারিণীর ন্যায় স্নেহ পরায়ণা আর একজন জননী এই পৃথিবীতে রহিয়াছেন। ভগবান

তোমাকে যেরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিয়াছেন, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধি করতঃ পুত্র কন্যাগণ সহ দীর্ঘকাল রাজত্ব ভোগ কর। দেবতা ব্রাহ্মণ সেবায় তোমার মতি স্থিরতর হউক এবং সর্ব্বথা যশস্বিনী হও।"

রাজা মাধব নারায়ণের পদার্পণ হেতু আমাদের ভবনে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন করা হইয়াছিল। আমি সেই সময়ে বাড়ী ছিলাম না। বরিশাল গবর্ণমেণ্ট স্কুলে পড়িতাম। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ এবং অন্যান্য প্রধান অমাত্যবর্গ রাজসম্মানসূচক 'নজর' দিয়াছিলেন।

রাজা মাধব নারায়ণ যত দিন জীবিত ছিলেন, ততকাল পর্য্যন্ত এই উপকার বিস্মৃত হন নাই; সর্ব্বসমক্ষে আমার মাতৃদেবীর এই অসীম কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতেন। অদ্যাপি উক্ত রাজবংশগণ এই উপকার স্মরণ করিয়া থাকেন।

মাতৃদেবী অতিশয় তেজস্বিনী নারী ছিলেন। সরলতা, অমায়িকতা, পরদুঃখকাতরতা, মহানুভবতা ইত্যাদি নানা প্রকার সদ্‌গুণ রাশিতে মণ্ডিত থাকিলেও বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেন, কিন্তু শত্রুগণ কর্ত্তৃক শান্তি স্থাপিত না হইলে, তিনি কোন ক্রমেই শত্রুকে ত্যাগ করিতেন না। নিজের "জেদ" প্রবল রাখিতে সর্ব্বদা যত্নবতী হইতেন। ছোট হিস্যার সহিত প্রায়ই বৈষয়িক বিবাদ উপস্থিত হইত; কিন্তু তিনি এমনি দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেন যে, তাঁহারা পদে পদে অপমানিত ও লজ্জিত হইতেন।

গ্রীণ বোট (নৌকা) মেরামত কার্য্য শেষ হইতে না হইতেই আমার পিতৃঠাকুর স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতৃদেবী

অতিশয় যত্ন সহকারে প্রভূত অর্থ ব্যয় দ্বারা বোট নৌকা নূতনরূপ মেরামত করাইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে সুদক্ষ রং মিস্ত্রী (Painter) আনয়ন পূর্ব্বক নানাবিধ উজ্জ্বল রঙ্গে বোট রঞ্জিত করিয়াছিলেন। গঙ্গাস্নান করিতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল, মধ্যে মধ্যে আমাদের সকলকে লইয়া কলিকাতায় গঙ্গাস্নান এবং কালী পূজা করিতে যাইতেন। কোন কোন বৎসর সকলকে লইয়া ২।৩ মাস কাল কলিকাতায় অতিবাহিত করিতেন। তথায় যে কয়েক মাস অবস্থান করিতেন প্রায় প্রত্যহই ব্রাহ্মণ ভোজন, পূজা, হোম, যজ্ঞ, পুরাণ পাঠ প্রভৃতি সৎকার্য্যে অতিবাহিত হইত। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মাতৃদেবী বিধবা হইবার পর হইতেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন প্রকার নিয়ম প্রতিপালন করিতেন না, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মূর্চ্ছা এবং গ্রহণী রোগের প্রকোপ ছিল। বিধবা হইবার পর হইতে ঐ সমস্ত রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল। আমরা নানা প্রকার ঔষধ আনিয়া দিতাম, কিন্তু তাহা কদাচিৎ গ্রহণ করিতেন। আমরা তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে জেদ করিয়া ঔষধ সেবন করিতে বলিলে তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেন,—"হিন্দু স্ত্রী গণের বিধবা হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু শ্রেয়স্কর। আমার আর বাঁচিয়া লাভ কি?' আমরা অত্যন্ত জেদ করিলে মধ্যে মধ্যে ঔষধ সেবন করিতেন মাত্র, কিন্তু পথ্য এবং শারীরিক নিয়ম পালন সম্বন্ধে আমাদের কোন কথাই শুনিতেন না।

রাত্রিতে কদাচিৎ নিদ্রা যাইতেন। প্রত্যহ বৈষয়িক কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে করিতে রাত্রি প্রায় ১০টা কি ১১টা বাজিয়া যাইত। সকলে চলিয়া গেলে পর নিশীথ সময় একাকিনী স্বতন্ত্রাসনে উপবেশনপূর্ব্বক পরমার্থিক চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। কোন কোন পর্ব্বোপলক্ষে

সন্ধ্যা হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত আসনোপরি উপবিষ্টা হইয়া উপাস্যা দেবীকে ধ্যান করিতেন। দুই এক দিন এরূপ বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইতেন যে আমরা ডাকিলেও উত্তর করিতেন না।

উপর্য্যুপরি কয়েকটি গুরুতর শোকে তাঁহার যে টুকু সামান্য স্বাস্থ্য ছিল তাহাও ভঙ্গ হইল। আমার তৃতীয়া ভগ্নীর ৭।৮ বৎসরের একটি কন্যা * পাঁচ বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র এবং তাঁহার আরও কয়েকটি অতি শিশু সন্তান নষ্ট হওয়ায় আমার জননী বড়ই শোকাতুরা হইয়াছিলেন। সর্ব্বদা সেই মৃতা বালিকার জন্য অশ্রুবর্ষণ করিতেন। সময় বুঝিয়া রোগসমূহও তাঁহাকে দ্বিগুণ বেগে আক্রমণ করিল। এই শোকাবেগ সম্বরণ হইতে না হইতেই আমার মধ্যমাদিদির একটি ছয় মাস বয়স্ক পুত্রের জীবনাবসান হইয়াছিল। যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা বাড়িল। মাতৃদেবী শোকে শয্যাশায়িনী হইলেন।

আমরা নানা প্রকার চিকিৎসা করায়, রোগ সমূহের প্রবল আক্রমণ বেগ কতক শান্তি হইয়া জীবনাশা হইল বটে কিন্তু শরীর অতিশয় শীর্ণ হইয়া গেল। চাঁপাফুলের ন্যায় বর্ণ কালিমা প্রাপ্ত হইল; মুখমণ্ডল মলিন এবং নিষ্প্রভ হইল।

১২৯২ সনের বৈশাখ মাসে আমার একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। মা আমার পৌত্র মুখ দর্শন করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে রোগ-যাতনা ভুলিয়া গেলেন। পূর্ব্বশোক সমূহ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিবৎ হৃদয়মধ্যে নিহিত করিয়া হাস্যমুখে নবজাত বালকটিকে বক্ষে ধারণ করিলেন। এই বালকের জন্মোৎসবে ব্রাহ্মণ, দীন, দরিদ্র প্রভৃতিকে প্রভূত অর্থদান

---

* এই কন্যাটিকে তিনি বড়ই স্নেহ করিতেন। যখন আমার পিতৃঠাকুর স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তখন এই বালিকা মাতৃগর্ভে ছিল। ভূমিষ্ঠ হইলে আমার জননীই ইহাকে পালন করিয়াছিলেন।

করিলেন। নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদের আজ্ঞা দিলেন। তিনি সর্ব্বদা ঐ বালকটিকে বক্ষে রাখিতেন, মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে নয়নান্তর করিতেন না।

এই প্রকার আনন্দে দেড় মাসের অধিক গত হইল। অকস্মাৎ তাঁহার সে আনন্দ ফুরাইতে বসিল। যাহার মুখপানে চাহিয়া অসহ্য দৌহিত্র দৌহিত্রী-শোক বিস্মৃতা হইয়াছিলেন, যাহাকে বুকে ধরিয়া দুর্ব্বিসহ ব্যাধি যন্ত্রণা উপশম বোধ করিয়াছিলেন,—তাঁহার সেই পৌত্রের কঠিন পীড়া উপস্থিত হইল। সচরাচর বালকগণের যেরূপ পীড়া হইয়া থাকে বালকটীরও সেই প্রকার পীড়া উপস্থিত হইল। জ্বর, তৎসহ হাঁপানি এবং মুখে ঘা প্রধান রোগ হইল। দেশীয় চিকিৎসকগণ, ওঝা এবং অন্যান্য চিকিৎসক মণ্ডলী চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই রোগ প্রতিকার হইল না। মা আমার বড়ই অধীরা হইয়া বরিশাল সিবিলসার্জ্জনকে আনিবার জন্য টেলিগ্রাফ করিতে আদেশ করিলেন।

ডাক্তার সাহেবকে আনিতে সংবাদ যাওয়ার পর হইতেই বালকটির একটু প্রতিকার লক্ষণ বোধ হইল। ইহার ব্যারামোপলক্ষে মাতৃদেবী কয়েক দিন যাবৎ কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করেন নাই, এবং চক্ষেও নিদ্রা দেন নাই। বালকটির প্রতিকার লক্ষণ দর্শন করিয়া অতি সামান্য বিশ্রাম করিবার জন্য নিদ্রিত হইলেন।

কিন্তু এই বালকটির এই প্রতিকার ক্ষণস্থায়ী, প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে যেরূপ উজ্জ্বলতর হইয়া হঠাৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, ইহারও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। জ্বর ত্যাগ হইয়া গেলে পর জ্বর প্রারম্ভের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বালকটি বেশ সুস্থ হইয়াছিল; কিন্তু

হঠাৎ জ্বরাগমের প্রারম্ভে তাহার প্রাণ বিযুক্ত হইল। ক্ষুদ্র প্রাণ আকাশে উড়িয়া গেল।

চতুর্দ্দিকে তুমুল আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইল। কিন্তু জননী তখনও গাঢ় নিদ্রায় মগ্না। তাঁহার সুখাকাশের বালচন্দ্র যে অকালে রাহু-কবলিত হইয়াছে তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। আমি তৎ-ক্ষণাৎ, পাছে ঐ আর্ত্তনাদ শ্রবণে জননীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়, সেই জন্য সকলকে রোদন করিতে নিষেধ করিয়া, আমি স্বয়ং তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া রহিলাম।

অচিরাৎ তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়া-ছিলাম যে কেহই যেন তাঁহার সমক্ষে রোদন না করে। নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া আমাদের সকলকে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে সমবেত দেখিয়া তাঁহার বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। অতি বেগে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যেমন অন্য প্রকোষ্ঠে গমন করিবেন, অমনি আমি তাঁহাকে ধরিলাম। এই দারুণ শোকে তিনি মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিতা হইতে লাগি-লেন। সেই রাত্রি তাঁহার এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে আমরা তাঁহার জীবনরক্ষা সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছিলাম। যে সময় চৈতন্যোদয় হইত, তখন উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেন।

মা আমার সেই শয্যা হইতে আর গাত্রোত্থান করিতে পারিলেন না। দারুণবেগের সহিত পূর্ব্ব প্রশমিত ব্যাধি সকল তাঁহাকে আক্রমণ করিল। মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার নয়নপ্রান্ত হইতে অশ্রুকণা দূর হয় নাই। সর্ব্বদাই মৃত পৌত্র, দৌহিত্র, দৌহিত্রীগণের জন্য বিলাপ করিতেন।

এই প্রকারে প্রায় এক বৎসর অতীত হইল। রোগ যন্ত্রণা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শরীর এতদূর শীর্ণ এবং দুর্ব্বল হইল যে

তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং পদচারণা করিতে পারিতেন না। আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎসক আনাইয়া, তাঁহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু রোগ কিছুতেই প্রশমিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বিধবা হইবার পর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল; এতদিন কেবল আমাদের মুখ পানে চাহিয়া, অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত দারুণ বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করতঃ শরীর ধারণ করিতেছিলেন। কিন্তু দারুণ শোকে তাঁহার সে সহিষ্ণুতা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি দিন দিন স্বর্গারোহণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

একদিন আমাকে বলিলেন "তুই আমার জীবিত থাকা সত্ত্বে তোর ছোট ভাই দুইটির বিবাহের আয়োজন কর্। আমি সেই দুইটি বউকে দেখিয়া মরিতে পারিলে কতক শান্তি উপভোগ করিতে পারিব।" আমি বলিলাম "মা! আপনার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব।"

তখনই পরামর্শ করিয়া, আমার মধ্যম ও তৃতীয় ভ্রাতার বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলাম। পাত্রী সুস্থির করিয়া শুভ কার্য্যের লগ্ন-পত্র ধার্য্য করিলাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ জননীর সেই আদেশ প্রতিপালিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন।

লগ্নপত্র স্থির হইবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। জ্বর, উদরাময়, কাস, শোথ, শ্বাস প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিসমূহ একসময়ে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। চিকিৎসকগণ বলিলেন ইঁহার যে প্রকার রোগের আক্রমণ দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে যে বিবাহের সময় পর্য্যন্ত ইনি জীবিতা থাকিবেন, তাহার বিন্দুমাত্র ভরসা নাই। আমাদের যতদূর চেষ্টা তাহা করিয়াছি; ইহাতে ফল হওয়া দূরে

থাকুক, বরং ব্যারাম ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের মতে ইঁহাকে কলিকাতায় লইয়া চিকিৎসা করান কর্ত্তব্য।”

১২৯৪ সালের ১২ই আষাঢ় তারিখে আমরা তাঁহাকে লইয়া কলিকাতায় গমন করিলাম। তথায় পৌঁছিয়া শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন, শ্রীযুক্ত কৈলাশ চন্দ্র সেন কবিশেখর, শ্রীযুক্ত বামাচরণ কবিরঞ্জন, শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন কবিরাজ প্রভৃতি রাজধানীস্থ যাবতীয় শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণকে দেখাইলাম। তাঁহার ব্যারামের অবস্থা দর্শন করিয়া সকলেই হতাশ হইলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণও দেখিলেন, তাঁহারাও কোন প্রকার ভরসা দিলেন না। তার পর বড় বড় এলিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ আসিলেন, তাঁহারাও রোগের অবস্থা দর্শন করিয়া হতাশ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

জননী দেবী আমাকে বলিলেন—“আমাকে চিকিৎসা করাইতে হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসা করাও, ডাক্তারি ঔষধ প্রাণ গেলেও স্পর্শ করিব না।”

বিধবা হওয়ার পর হইতে তিনি কোন প্রকার ডাক্তারি ঔষধ স্পর্শও করেন নাই।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মতানুসারে চিকিৎসকাগ্রগণ্য স্বনাম প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন মহাশয় চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কবিরাজ মহাশয়ের সুচিকিৎসায় এক মাস মধ্যেই তাঁহার ব্যারাম অনেক পরিমাণে উপশম হইল। পূর্ব্বে বিনা সাহায্যে শয্যার উপর উপবেশন করিতে পারিতেন না; ঔষধির গুণে তিনি স্বয়ং শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে পারিতেন।

আমাদের মনে ভরসা হইল; ভাবিলাম বুঝি আমাদের প্রতি বিধি সদয় হইয়াছেন। কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের বড় ভরসা হইল না। তিনি বলিতেন যে, স্থানপরিবর্ত্তনে রোগের সামান্য উপশম হইয়াছে, ইহা স্থায়ী হইবার সম্ভব নাই।

মাতৃদেবী তখন মধ্যে মধ্যে গাড়ীতে ৺কালীঘাট মায়ের পূজা দিতে এবং গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া আমি বাড়ী চলিয়া আসিলাম। এই সময় তিনি একবার ৺কাশীধামে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, কবিরাজ মহাশয় নিষেধ করিয়া বলিলেন যে, দুর্ব্বল শরীরে ট্রেণের কষ্টে তাঁহার ব্যারাম বৃদ্ধি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভব। মাতৃদেবী তথাপি যাইতে চাহিলেন। কিন্তু রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা হেতু আমরা প্রতিবন্ধক হইলাম।

বাড়ী আসিয়া কয়েকদিন পরে সংবাদ পাইলাম যে, মাতৃদেবীর ব্যারাম অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া শয্যাশায়িনী হইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় পৌঁছিয়া দেখিলাম যে, তাঁহার ব্যারাম দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বলক্ষিত সমস্ত ব্যাধিরই পূর্ণ বিকাশ উপস্থিত। জননী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে পারেন এমন শক্তি নাই।

মনে ভাবিলাম বুঝি আমাদের চিরদুঃখ-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া প্রত্যক্ষ ঈশ্বরী স্বরূপিণী স্নেহময়ী জননী আমাদের মাতৃহীন করিয়া যাইবেন। পুনরায় দ্বিগুণ তেজের সহিত চিকিৎসা আরম্ভ হইল। সপ্তাহকালের অধিক তিনি জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান ছিলেন। কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের সুচিকিৎসার গুণে, আবার রোগসমূহ প্রতিকার হইতে আরম্ভ করিল। তিনি দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিলেন। ক্রমে শয্যা হইতে বিনাবলম্বনে উঠিয়া বসিতেন। তার পর ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বের ন্যায় বিনা সাহায্যে বাহিরে শৌচক্রিয়াদি নির্ব্বাহ করিতে

সমর্থ হইলেন। এমন কি দুই এক দিন স্বহস্তে আমাদের জন্য আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেন। দেখিয়া শুনিয়া আমাদের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল।

১লা আশ্বিন সন্ধ্যার সময় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "বাড়ী একেবারে খালি রহিয়াছে; বিশেষতঃ পূজা একেবারে নিকটবর্ত্তী, আমি পীড়িতা হইয়া বিদেশে থাকিলাম, লাঠের খাজনা দাখিল হইল কিনা, এবং পূজাইবা কি প্রকার নির্ব্বাহ হইবে তাহাও ভাবিয়া পাই না। আমার এখন অনেক ভাল হইয়াছে, তুমি অল্প কয়েক দিনের জন্য একবার বাড়ী যাও; বিজয়া দশমির পরদিন বউকে এবং খুকীকে * লইয়া আসিও। তাহাদের দেখিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।"

আমি বলিলাম "মা আপনার যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে আপনাকে ফেলিয়া যাইতে আমার সাহস হয় না। বাড়ীতে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সুশৃঙ্খলারূপে নির্ব্বাহ হইবে; আপনি তজ্জন্য কোন চিন্তা করিবেন না।

মা বলিলেন "সে যাহাই হউক, পূজার সময় তোমাদের চারি ভাইর মধ্যে অন্ততঃ একজনের বাড়ী থাকা নিতান্ত আবশ্যক। আমার ব্যারাম এখন অনেক প্রতিকার হইয়াছে; বিশেষতঃ আট দশ দিনের জন্য তোমার যাইতে কোন ক্ষতি নাই।"

যখন আমি এবং মা এই সকল কথোপকথন করিতেছিলাম, তখন শ্রীযুত দ্বারকা নাথ সেন কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। আমি এবং মা কি কথোপকথন করিতেছিলাম, তিনি জিজ্ঞাসা

* তখন আমার একটি কন্যা জন্মিয়াছিল; এই বালিকা ১২৯৭ সালের ২২শে পৌষ তিন বৎসর সাত মাস বয়সে কলেরারোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

করিলে, আমি তাঁহার নিকট মূলমর্ম্ম জ্ঞাপন করিলাম। কবিরাজ মহাশয় হাস্যমুখে বলিলেন "আট দশ দিন কেন, আপনার মাতৃ-ঠাকুরাণীর যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে মাসাবধির জন্যও কোন আশঙ্কার কারণ নাই। আপনি স্বচ্ছন্দে বাড়ী যাইতে পারেন।

কবিরাজ মহাশয়ের কথায় আমার অনেক ভরসা হইল। মাতৃ-দেবীর যে সাজ্ঘাতিক পীড়া উপস্থিত, এবং এই ব্যাধি হইতে তাঁহার মুক্তিলাভ ঈশ্বরেচ্ছা, তাহা অনেকটা বুঝিয়াছিলাম। তথাপি সময়ে সময়ে তাঁহার প্রতিকারাবস্থা দর্শন করিয়া সমস্ত ভুলিয়া যাইতাম। আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ শৈশবকালে, পিতৃস্বর্গারোহণ দর্শন করিতে পারি নাই, তাই, সর্ব্বদা মাতৃ সন্নিধানে উপস্থিত থাকিতাম। পাছে মাতৃ স্বর্গারোহণ দর্শন করিতে অসমর্থ হই, এই আশঙ্কা আমার অন্তঃ-করণ মধ্যে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল।

আশার কুহক মন্ত্রে ভুলিলাম। ভাবিলাম যে জননী বুঝি সত্য সত্যই আরোগ্য পথে আরোহণ করিয়াছেন। ২রা আশ্বিন রাত্রির গাড়িতে আমি আমার তৃতীয় এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ, বাড়ী যাইতে মনস্থ করিলাম। হায়! সেই আমার শেষ মাতৃচরণ দর্শন। পূর্ব্বজন্মে যে কত সহস্র দারুণ পাপ করিয়াছিলাম, সেই পাপের ফলে আমি জননীর শেষ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইলাম না। আমার মধ্যম ভ্রাতাকে মাতৃসন্নিধানে রাখিয়া, আমরা তিন ভাই বাড়ী প্রস্থান করিতে উদ্যোগ করিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যার পর যখন মাতৃদেবীর শ্রীচরণাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে তাঁহার প্রকোষ্ঠে গমন করিলাম, তখন দেখিলাম যে তিনি শয্যার উপর উপবেশন করিয়া আছেন। বাড়ী হইতে অনেক দ্রব্যাদি আনয়ন

করিতে বলিয়া দিলেন। দশমীর দিন যাত্রা করিয়া যাহাতে একাদশীর দিন রওনা হইতে পারি সেই বিষয় পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিলেন। আমরা তিন ভাই তখন তাঁহার পূত শ্রীচরণ যুগলে প্রণত হইলাম, তিনি আমাদের শিরে হস্তার্পণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন।

হায়! আমাদের অদৃষ্টে আর সেই দেবদুর্ল্লভ পবিত্র স্নেহাশীর্ব্বাদ ঘটিয়া উঠিল না। সেই শান্তিময়ী দেবী প্রতিমা-দর্শন আর এই হতভাগ্যের অদৃষ্টে ঘটিল না।

যাত্রার সময় অকস্মাৎ আমার হৃদয় শিহরিয়া উঠিল; বাম চক্ষু স্পন্দিত হইল। আশার কুহকিনী মায়ায় সেই পূর্ব্ব অশুভ সূচনা মনে স্থান দিলাম না। ভাবিলাম যে বিজয়ার পরদিন যাত্রা করিয়া অবশ্যই মাতৃচরণ দর্শন করিতে পারিব।

হায়! বুঝিলাম না যে বিধাতা এই পাপীষ্ঠের অদৃষ্টে সে পুণ্যটুকু লিখেন নাই। আমা-হেন মহাপাপী যে সাক্ষাৎ পুণ্যময়ী মূর্ত্তি পূজা করিতে অসমর্থ, তাহা একবারও ভাবিলাম না। ত্বরিত পদে মাতৃসদনে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাহিরে আসিলাম। আমার ভাগ্যে আর মাতৃচরণ দর্শন ঘটিল না।

যথা সময় আমরা তিন ভাই বাড়ী পৌছিলাম; বাড়ীর সকলেই নিরানন্দ। একমাত্র আনন্দময়ীর বিহনে চতুর্দ্দিকে নৈরাশ্যের তীব্র ভ্রূকুটি। জননী যে প্রকোষ্ঠে থাকিতেন, তাহার দিকে চাহিলে হৃদয় শিহরিয়া উঠিত; শত লোক থাকিতেও যেন সেই প্রকোষ্ঠ অন্ধকার। আমি ইহার পূর্ব্বে যে বাড়ী আসিয়াছিলাম, তখন ততদূর বোধ হয় নাই; ভাবী অমঙ্গলের হেতুই বিধাতা আমার নয়ন পথে ঐ সমস্ত দুর্লক্ষণ দর্শন করাইলেন।

অধিবাসের দিন আমার মধ্যম ভ্রাতার এক টেলিগ্রাম পাইলাম।

টেলিগ্রামে 'মার জ্বর হইয়াছে, আপনি ব্যস্ত হইবেন না, বিজয়ার পরদিনই রওয়ানা হইবেন।'

টেলিগ্রাম পাইয়া আমার হৃদয় শুকাইল। আমি আবার টেলিগ্রাম করিলাম। উত্তরে জানিলাম যে, মাতৃদেবীর জ্বর একভাবেই আছে, কবিরাজ বলিতেছেন কোন ভয় নাই।

আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। একবার ভাবিলাম যে, কবিরাজ যখন কোন ভয়ের কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই, তখন অবশ্যই আশঙ্কা নাই। আর ব্যারাম সাংঘাতিক হইলে, অবশ্যই আমাকে সবিশেষ জানাইত। সাত পাঁচ ভাবিয়া গমনে ক্ষান্ত রহিলাম।

আমি হতভাগ্য তখন বুঝিলাম না যে, মাতৃচরণ দর্শনজনিত পুণ্যলাভ জগদম্বা আমার অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ করেন নাই।

সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী পূজার দিনমান কোন প্রকারে গত হইল। কিন্তু এই কয় দিন মধ্যে জননীর কোন প্রকার সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই; মন বড়ই উদ্বিগ্ন।

নবমী পূজার সন্ধ্যারতি করিতে রাত্রি প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। আমি তখন দুর্গামণ্ডপে কয়েকজন কর্ম্মচারীর সহিত বসিয়া আছি; কয়েকদিন যাবত মার কোন সংবাদ পাই নাই,সেই বিষয়ই আলোচনা করিতেছি।

অকস্মাৎ সেই দশভূজা মূর্ত্তি ঈষৎ কম্পিত হইল, প্রতিমার পশ্চাৎস্থিত প্রদীপও সেই মুহূর্ত্তে নির্ব্বাপিত হইল। আমি সমস্তই লক্ষ্য করিলাম; আমার হৃদয় দুর দুর করিতে লাগিল। ঠিক এই সময় সজ্ঞানে, অর্দ্ধ গঙ্গাজলে, আমার জননী ৪৫ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিলেন। প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইবার পূর্ব্বেই আমাদের আরাধ্যা প্রতিমা

বিসর্জ্জিত হইল। আমাদের সেই স্বর্গীয় মধুর "মা" ডাক জনমের তরে ফুরাইল; আমাদের সহিত এতদ্দেশীয় যাবতীয় নরনারী মাতৃ-হীন হইলেন। স্বর্ণ কমল গঙ্গা জলে ভাসিতে লাগিল। জননী-জাহ্নবী তরঙ্গরূপ কর দ্বারা তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে সব ফুরাইল। ১২৯৪ সালের ৯ই আশ্বিন মহানবমীতে মা আমার জগন্মাতার পাদপদ্মে বিলীন হইলেন।

আমার মধ্যম ভ্রাতাই মাতৃদেবীর ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধা করিল। প্রকৃত পুত্রের কার্য্য তাহার দ্বারা নির্ব্বাহিত হইল। সে পুণ্যবান্, তাই, ভগবান্ তাহার অদৃষ্টে এই পুণ্যটুকু লিখিয়াছিলেন।



সমাপ্ত।